বিকাশ ও ব্যথা

(উপন্যাস)

ভাগ্যনিরূপিতা, হিমানী, পরিণয়-পারে, প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু বি, এ,

প্রণীত।

১৩৩০।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক

শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ।

আইডিয়াল প্রেস।

৪নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র সাউ

জমিদার। (ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা)

ভাই শরৎ।

আমার এ 'ব্যথা'ও তোমাকে

নিবেদন কর্ল্‌ম।

পুরী, ভব-আশ্রম।
১৫ই আষাঢ় ১৩৩০

তোমার
নৃপেন্‌।

Truth is stanger than fiction,
Reason stronger than passion.
You Can not say, my friend, no
Belive me, at times it happens so.

N. Basu.

উপহার

বিকাশ ও ব্যথা

কুঁড়ি ফুটিতে চাহে। তাহার বুকভরা অধীর গন্ধ, হাসির তরঙ্গ প্রাণে তাহার কত অস্ফুট আশা, মধুময় আলস্য! ওগো আমি আসিয়াছি, আমি ফুটিব, সফল হইব। আলো, আলো, আর একটুকু আলো!

আঃ কী আনন্দ! কী তৃপ্তি! বাঃ মাথার উপর ঐ সোনার খেত্ থেকে ও কে ও তরুণ, স্নিগ্ধ মধুর নয়নে আমার দিকে চাহিতেছে? আরে এ আবার কে মদির স্পর্শে আমার ক্ষুদ্র প্রাণে আবেশভরা শিহরণ জাগাইয়া দিতেছে? ওরে চোর! তুমি বুঝি চোখে আমার নিদুলা দিয়া গন্ধটুকু বহিয়া লইয়া যাইতে চাও! তোমরাই বা কা'রা, গুণগুণ করিয়া আমার আশে পাশে কেন ঘুরাঘুরি সুরু করিলে? একি! জোর করিয়াই কি তোমরা আমার বুকের মধু লুটিয়া লইবে নাকি? সে হইবে না, আমি ত তোমাদের কা'রও জন্ম আসি নাই। এখনও যে আমার নীচের পাপড়ীগুলা ফুটে নাই, আমায় ভাল করিয়া ফুটিতে দাও। আমি আসিয়াছি, ফুটিব, আমি আলো দেখিতে চাই, ওগো আমি ফুটিব, হাসিব, নিজের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিব, তারপর—তারপর আমি সফল হইব।

(বড় আশা, ফুল ফুটিতে চাহে, সফল হইবে? বেশ্, বেশ্!)

বিকাশ ও ব্যথা

কাল ভোমরা কোথা হইতে বোঁ বোঁ শব্দে আসিয়া আধ'ফোটা পাপড়ীগুলাকে সবলে ঠেলিয়া ফুলের ভিতর প্রবেশ করিল ; তীক্ষ্ণ শুঁড়ে ফুলের হৃদয়মধু চুসিতে চুসিতে পায়ের আঁচড়ে ফুলের বুক কত বিক্ষত করিয়া দিল। অত্যাচারী ভ্রমরের ভরে ক্ষীণ বৃন্ত নত হইয়া পড়িল।

সব মধুটুকু নিঃশেষে লুটিয়া লইয়া, অঙ্গে ফুলের রেণু মাখিয়া নির্মম ভোমরা উড়িয়া গেল। দুই একটি মৌমাছি পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে ঘুরিয়া ফিরিয়া ভিতরে অনুসন্ধান করিতে লাগিল এক আধ কণা মধু যদি অবশিষ্ট থাকে। লজ্জায় যন্ত্রণায় ফুল নতমুখে মাটীর দিকে নুইয়া পড়িল—সঞ্চিত শিশির বিন্দুগুলি ক্ষরিয়া পড়িতে লাগিল। বিলাসী রবির করও তাহার নিষ্ঠুর খেলা আরম্ভ করিল, উৎপীড়িতার শিথিল বিবশ দেহখানি লাজহীন দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। ফুল শুকাইতে লাগিল। দূর নদীর বুক হইতে সহানুভূতি-কোমল একটা শীতল-স্পর্শ বহিয়া আনিয়া বাতাস তাহাকে তখনও সজীব রাখিল। ফুল আর ফুটিতে পাইল না, তাহার সফল হওয়ার আশা বিফল হইল।

আসার সময় কত তরল আশা, নির্ব্বাক বাসনা—কত কি পাইব! না জানি কত যুগযুগান্ত ধরিয়াই এই বিশাল ধরণী আমারই আশা পথ চাহিতেছিল, বুকে তাহার অপার স্নেহ, হস্তে চির মধুময় সুখ-ঐশ্বর্য্যের মালা, মুখে স্নিগ্ধ করুণ হাসি; আজ আমাকে বুকে ধরিয়া ধরায় আর আনন্দ ধরে না।

সব ভুল! সবই ভ্রান্তি! শিশুর সোনালী কল্পনা ঝড়ে উড়িয়া বাজভরা অন্ধকার মেঘের বুকে জমাট বাধিয়া যায়। মাটীর ধরা মাটীরই, এ শুধু আছাড় খাইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার জন্যই, নিরস কঠোর জড়তা!

বিকাশ ও ব্যথা

জগতের হাসি সহানুভূতিহীন, মমতার লেশশূন্য, উপহাস মাত্র। স্বার্থ, স্বার্থ! কেহ কাহারও মুখ চাহে না, পড়িয়া গেলে তুলিয়া ধরিবার জন্য কেহ অঙ্গুলি সঞ্চালনও করে না। পদে পদে উপহাস, শত বাধা, হিংসা বিদ্রূপ!

আশা শুকাইয়া যায়, বাসনা রুদ্ধরোদনে ফাটিয়া চুরমার হয়। আর্তনাদ, জীবনব্যাপি নিষ্ফলতা।

বিকাশ ও ব্যথা

PUBLIC LIBRARY
১৯৯৬

(১)

আই এ পরীক্ষা দিতেছিলাম। সিট্ পড়িয়াছিল [illegible] কলেজে। সেখান হইতে বাহির হইয়া সিধা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়া কয়েক মিনিটের জন্ত বসিতাম। বাসা ছিল চোরবাগানে কিন্ত ভবানীপুরে টিউসনি করিতে যাইতে হয়; ছাত্র নূতন ক্লাসে উঠিয়াছে, কাযেই ছুটী চাহিয়াও পরীক্ষার এ কয়দিনের জন্ত ছুটী পাই নাই। ট্রামে যাইবার পয়সা ছিল না, হাঁটিয়াই যাতায়াত করিতে হয়।

বাগানে ঢুকিয়া নিরিবিলি আর একবার প্রশ্নপত্রগুলি বাহির করিয়া সশঙ্কচিত্তে হিসাব করিতাম—কত মার্ক পাইবার সম্ভাবনা। একদিন চোখে পড়িল, বেঞ্চের অপর প্রান্তে উপবিষ্ট বৃদ্ধ সাহেবটি কেমন বিস্ময় সপ্রশ্ন দৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। প্রত্যহই লক্ষ্য করিতাম আমার আসিবার পূর্ব্ব হইতেই সাহেবটি এই বেঞ্চখানার ঠিক ঐ জায়গাটিতে একই ভাবে বসিয়া থাকিতেন। সমস্তদিনের সঞ্চিত ক্ষুধার এতটুকুও উপশম না হইলেও, ভদ্রলোকের এই বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে পকেট হইতে শুক্না ছোলা ভাজা বাহির করিয়া খাইতে এবার কেমন লজ্জা বোধ হইল। বাগানে ঢুকিবার সময় ফটক হইতে

রোজ এক পয়সার ঝাল চানা বা চিনা বাদাম ভাজা কিনিয়া লইতাম।

পরদিন, সেদিন 'লজিকের' পরীক্ষা ছিল, বাগানে বসিয়া প্রশ্নপত্রগুলি নাড়াচাড়া করিতেছিলাম, হঠাৎ সাহেবটি বেশ পরিস্কার বাঙ্গলায় বলিলেন—কি, আজ কত মার্ক হ'ল? তাঁহার মুখে সহাস্যভাব। সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—লজিক পেপার আজ কেমন লিখ্‌লে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি।

প্রথম প্রশ্নের অর্থ এবার বুঝিলাম, একটু লজ্জিত ভাবেই বলিলাম—মন্দ না, ভালই হয়েছে।

আবার একটু হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—ওঃ তাই আজ খিদেও নেই দেখ্‌ছি, কই আজ ত আর ছোলা ভাজা খাচ্ছ' না?

মনে মনে ভদ্রলোকের উপর বেশ রাগ হইল—এ সব খোঁজে দরকার কি মশায়ের? ক্ষুধা কি পায় নাই, যথেষ্টই পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যে পকেটে ছোলাভাজা কিনিবার পয়সাটিও নাই!

প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম।

—বাড়ী কি তোমার এখান থেকে কাছেই? তা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী না ফিরে রোজ এখানে এসে ব'সে থাক' কেন? রোজই লক্ষ্য করি, আজ আর কৌতুহল দমন কর্ত্তে পার্লুম না। বুড়োর কথায় কিছু মনে ক'রো না।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিলাম, নম্রভাবে বলিলাম—এদিকে ত আমার বাসা না, চোরবাগানে থাকি আমি। হরিশ মুখার্জির বাটে টিউসনি করি, বাসায় ফিরবার সময় হয় না।

ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে বলিলেন—পরীক্ষার ক'দিন ছুটী নাও নি কেন?

—ছুটী পাই নি।

—ছুটী দেয় নি তারা! কত টাকা পাও সেখানে?

—আগে দশ টাকা করেই পেতুম, সম্প্রতি ছাত্রটি সেকেণ্ড ক্লাসে ওঠাতে বার টাকা ক'রে দিতে স্বীকার হয়েছেন তাঁরা।

—মোটে দশ বার' টাকা পাও! তা যাতায়াতের ট্রাম ভাড়াতেই ত আট দশ টাকা লাগে, তোমার থাকে কি?

—আজ্ঞে আমি ত ট্রামে যাই আসি না, হেঁটেই যাতায়াত করি।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিনিট খানেক পরে অন্যদিকে ফিরিয়া বোধ হয় তিনি অন্যমনস্ক হইলেন।

একটা অজানা বাহিরের লোকের কাছে এতগুলা কথা বলিয়া ফেলিয়া লজ্জা বোধ করিতেছিলাম! যা'ক এখনও অনেকখানি পথ যাইতে হইবে, বোধ হয় ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে—আমি যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হঠাৎ ভদ্রলোক এদিকে ফিরিয়া বলিলেন—যেও না, আর একটু বস'।

অপরিচিতের এরূপ আচরণে আমি কেমন থতমত খাইয়া গেলাম, দ্বিরুক্তি না করিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে বসিয়া পড়িলাম। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নামটি কি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?

—নরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

—ঘোষ! ওঃ হিন্দু, কায়স্থ! আমিও কায়স্থের ঘরে জন্মেছিলুম,

আমার নাম চার্লস্ অজিত বোস্। তা কে আছেন তোমা বাড়ীতে ?

—দেশে মা আছেন, দাদা চাকুরী করেন, সপরিবারে এখানেই থাকেন।

—এত কষ্ট ক'রে টিউসনি কর' কেন, দাদার কাছে সাহায্য নাও না কেন ?

তাঁর বাসাতেই থাকি, তবে কলেজের মাহিনাটা নিজেকেই যোগাড় ক'রে নিতে হয়।

বৃদ্ধ আবার কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার এতখানি অনধিকার চর্চ্চায় মধে মনে বিরক্ত হইলেও, কি জানি তাঁহার কণ্ঠস্বরে কি ছিল, বাধ্য হইয়াই যেন আমি তাঁহার সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিতেছিলাম।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, সাড়ে সাতটার মধ্যেই ছাত্রের বাড়ী হাজিরা দিতে হইবে। এবার আমি ব্যস্তভাবেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম, একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া বলিলাম—দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, আমি উঠলুম।

বৃদ্ধ কোনও উত্তর করিলেন না, তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই এক পা আসিয়া হঠাৎ বলিলেন—খবরের কাগজ প'ড়ে শোনাবার জন্যে আমি একটা লোক খুঁজছিলুম, সকালে হ'ক সন্ধ্যায় হ'ক রোজ ঘণ্টাখানেক কাগজ বা বই টই প'ড়ে শোনাবে, মাসে টাকা কুড়ি দিতে পারি।

একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল—এ কাজ নিতে তোমার কি আপত্তি আছে ?

'আপত্তি'! এমন সৌভাগ্য কি আমার হইবে? কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলিলাম—দয়া ক'রে আপনি যদি কাজ দেন—আমার দ্বারা যদি আপনার কাজ চলে—সে আমার সৌভাগ্য ব'লে মনে করব'। অনুগ্রহ ক'রে আপনার ঠিকানাটা যদি ব'লে দেন—কাল সকালেই দেখা করব', কাল ছুটী, এখন আমিন নেই।

একটু দূরে ও ফুটপাথের পাশে একখানি ফিটন গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, সেখানি আসিয়া এবার সম্মুখে দাঁড়াইল, সহিস তাড়াতাড়ি দরজাটি খুলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সাহেব বলিলেন—সকালে যাবে, কিন্তু সকালে ত আমার সঙ্গে দেখা হবে না। বরং এখনই কেন আমার সঙ্গে চল' না।

আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম—তাই ত' শেষটা কি মিছামিছিই পড়াইতে যাওয়া কামাই করিব?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন—কি, বার' টাকার টিউসনির মায়া ছাড়্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না? অবশ্য মনে করো না তোমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করাই বুড়োর উদ্দেশ্য।

লজ্জিত ভাবে কি বলিতে যাইতেছিলাম, তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—এস ঘোষ, উঠে এস।

এখনই যাইব কি—ভাবিবার সময় ছিল না, উঠিয়া বসিয়া পড়িলাম। মাসে বিশ টাকা মাহিনা, বাড়ীর কাছে—দেখি ভগবান আজ বুঝি সদয় হইলেন!

মিনিট পনের' পরে গাড়ী আসিয়া ইটালী পদ্মপুকুর রোডে একটি ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। দুই ধারে ক্রোটন ও নানা রকমের ফুলের

গাছ, একটা কৃত্রিম ঝর্ণা হইতে জল পড়িতেছিল। একখানা বাঙ্‌লো প্যাটার্ণের একতলা বাড়ীর নীচে গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়ী-বারাণ্ডার দেওয়াল আইভি লতায় ঢাকা, সিঁড়ির উপর টবে-করা কতকগুলা বিলাতি গাছ। গাড়ী হইতে নামিয়া সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। খান্‌সামা আসিয়া তাড়াতাড়ি প্রভুর হাত হইতে টুপি ও ছড়িটি লইল। তাহাকে পাখা খুলিতে বলিয়া আমাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া গৃহস্বামী বলিলেন—বস। নিজেও তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, ঘরখানি নানা প্রকার মূল্যবান স্বদেশী বিদেশী আবশ্যক অনাবশ্যক আস্‌বাবপত্রে সজ্জিত। চেয়ারে বসিয়া কুণ্ঠিতভাবে লক্ষ্য করিলাম, আমার ছিন্ন অপরিচ্ছন্ন জুতাজোড়া এমন সুন্দর কার্পেটের বুকে দারিদ্রের কতগুলা ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে। সাহেব আমার অশ্রুত স্বরে খান্‌সামাকে কি উপদেশ দিতেছিলেন।

খটাং করিয়া হঠাৎ একখানি পর্দ্দা সরাইয়া সহাস্যমুখে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকিলেন। আমার উপর দৃষ্টি পড়িতে হাস্যভাব একটু সংযত করিয়া তিনি সাহেবের চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ফিরিয়া বসিয়া সাহেব সস্নেহ হাস্যে ইংরাজীতে বলিলেন—সন্ধ্যা বেলা ঘরের কোণে কি কচ্ছিলে বাছা? আজ কি বাগানেও যা'য় হওনি নাকি? ক'দিন ত বেড়াতে যাওয়াও একেবারে ছেড়ে দিয়েছ।

মুখ ঘুরাইয়া একবার আমার দিকে চাহিয়া লইয়া তরুণী বলিলেন—এতক্ষণ ত বাইরেই ছিলুম বাবা, এই ত একটু আগে ঘরে ফিরেছি।

হঁ বেড়াতে যাব, তাহলেই হয়েছে আর কি, যে ওস্তাদ বাবুর্চি এনেছেন এবার, নিজে না দেখ্‌লে সবাইকে উপোসেই কাটাতে হবে।

—হ্যাঁরে পাগ্‌লি, উপোস কর্ত্তে হবে বৈকি, বুড়ো বাপের প্রতি ভালবাসায় দিন দিন তুই ভারী খুঁৎমুতে হ'য়ে উঠ্‌ছিস্‌, কিছুতেই মন ওঠে না তোর।

কন্যার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সাহেব আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওঃ উনি! আমার একটি নবলব্ধ বন্ধু—নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, উনি এবার I. A. Examinationএ appear হচ্ছেন। হ্যাঁ মাষ্টার ঘোষ, এটি হচ্ছে আমার একমাত্র সন্তান,Miss N. Greenly—নীলিমা বোস।

মিস্ গ্রীন্‌লে সলজ্জভাবে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া বেশ সহজ বাঙ্গালায় বলিলেন—কেমন পরীক্ষা দিতেছেন?

প্রতি নমস্কার করিতে ভুলিয়া গিয়া, কোন গতিকে বলিয়া ফেলিলাম—হ্যাঁ, মন্দ না।

দেশী সাহেবের মুখে বাঙ্‌লা শুনিয়া এতক্ষণ বিশেষ আশ্চর্য্য হই নাই, এবার মেমের মুখে এমন খাঁটী বাঙ্‌লা কথায় বিস্ময়ের মাত্রাটা খুব বেশীই হইয়াছিল। তাহা ছাড়া নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর দৃষ্টিসম্মুখে আপনাকে কেমন বিব্রত বোধ করিলাম। বোস সাহেব কন্যাকে বলিলেন—আলাপ পরে হবে, এখন ক্ষুধার্ত্ত অতিথির জন্য কিছু খাবার আন'ত মা—

সন্ত্রস্ত ভাবে বলিলাম—না না, সে জন্য ওঁকে কষ্ট কর্ত্তে হবে না আমি কিছু খাব না—কিছু দরকার নেই, মাপ কর্ব্বেন।

স্থির দৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বোস্ সাহেব বলিলেন—কেন, কিছু ফল টল খেতে আপত্তি কি? খৃষ্টানের বাড়ীতে—

বাধা দিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলাম—না না তা না, মিছে কেন উনি কষ্ট কর্ব্বেন, কিছু দরকার নেই, তাই বারণ কচ্ছি,-মাপ কর্ব্বেন।

এই ত সবে দু'ঘণ্টার পরিচয়, তাহা ছাড়া ইতিপূর্ব্বে কোনও খৃষ্টানের বাড়ী ঢুকিবার দরকার হয় নাই, খাওয়ার কথা দূরে থাক্; হঠাৎ এখানে খাদ্য গ্রহণের সম্ভাবনায় মনে মনে যে একটা আতঙ্ক না হইয়াছিল এমন নহে, তবে সেটা যে আমার কোনও গোঁড়ামির দরুণ তাহাও নহে, তবুও কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

বোস সাহেব বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার আছে, এম্নি রাজী না হ'লে কিন্তু তোমার সমস্ত দিনের পর বাগানে ব'সে টিফিনের কথা এখনই প্রকাশ ক'রে দেব। যাও ত মা, বেয়ারাকে ব'লে দিয়েছি, কিছু ফল পাকড় আর খানকতক বিস্কুট আন দেখি চট ক'রে। সেই ন'টার পর থেকে সমস্ত দিন Master Ghosh কিছুই খান্‌নি।

সহানুভূতি-করুণ দৃষ্টে একবার আমার দিকে চাহিয়া তরুণী বাহির হইয়া গেলেন।

বোস সাহেব বলিলেন—তা হলে আমার কাছে কাজ নিতে তুমি সম্মত আছ, কেমন?

সকৃতজ্ঞে বলিলাম—আজ্ঞা হাঁ।

—বেশ, ভাল। কাল ত তোমার ছুটী আছে, সকালে একবার সময়মত ভবানীপুরে গিয়ে ছেলে-পড়ান কাজে জবাব দিয়ে এস।

আর পার ত কালই সন্ধ্যার সময় যখন হয় এখানে এস। পরীক্ষাও ত তোমার শেষ হ'য়ে এল, আর ক'দিন বাকী আছে?

—আর দুদিন হয়েই শেষ হবে।

—তবে আর কি, আজ থেকেই তোমাকে নিযুক্ত করল্যুম, পরীক্ষার এ দুদিন ছুটী রইল'। তারপর রোজ সন্ধ্যার পর এখানে আসবে, উপস্থিত কুড়ি টাকা মাইনে ও পাঁচ টাকা ট্রাম ভাড়া পাবে।

এতখানি দয়া বুঝি জীবনে আর কাহারও নিকটে পাই নাই—নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছেও না। মনে পড়িল পরীক্ষার ফি সংগ্রহের জন্য দাদার কাছে হাত পাতিয়াছি, সকল আত্মীয়-বন্ধুর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়াছি, কাহারও কাছে এতটুকু সাহায্য পাই নাই। আজ অপরিচিত পরধর্মীর নিকট এতখানি দয়া এতখানি সহানুভূতি পাইয়া আমি যেন কেমন বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলাম, কেমন করিয়া কি বলিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিব খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, অস্ফুট স্বরে বাহির হইয়া গেল—God bless you sir,—(ভগবান আপনার মঙ্গল করুন)।

মিস্ বোস ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার পশ্চাতে বেয়ারা একখানি ঝক্‌ঝকে রূপার ডিসে কতকগুলি কাটা ফল ও একখানি পীরিচে কয়েকখানি বিস্কুট লইয়া ঘরে ঢুকিল। সেগুলি তাহার হাত হইতে লইয়া মিস্ বোস নিজে আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন। বোস সাহেব বলিলেন—নাও ঘোষ, খেয়ে নাও, আমরা এখন খাব' না, সাড়ে আটটার সময় একেবারে খাই।

সাহেব-মেমের সামনে কি করিয়া খাই,—বড়ই লজ্জা করিতে

লাগিল। একটু ঘুরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলাম। পিতা পুত্রী নিজেদের ভিতর কি কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, বোস সাহেব হঠাৎ বলিলেন—কই বেয়ারা জল দিয়ে গেল না?

আমার দিকে ফিরিয়া মৃদুহাস্তে মিস্ বোস বলিলেন—জল খাবেন কি, না লাইমেড্ আন্‌তে বলব'?

জল খাবেন না, লাইমেড্ খাবেন! ওঃ, হাসির কারণটা চট্ করিয়া বুঝিতে পারিয়া মরিয়া ভাবেই বলিলাম—জলই আন্‌তে বলুন।

আমার জলযোগ শেষ হইতেই বোস সাহেব বলিলেন—আজ আর তোমাকে বেশী দেরী করাব' না, তা হ'লে ঐ কথাই রইল, কাল সন্ধ্যার পর আসছ' ত?

—আজ্ঞা হাঁ, ছ'টার মধ্যেই আস্‌ব' আমি। পিতা পুত্রীকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।

---

(২)

পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ প্রায় মাস খানেক প্রতি সন্ধ্যাতেই বোস সাহেবের বাড়ীতে আসিতেছি। কাগজ পড়া নাম মাত্র, মধ্যে মধ্যে দুই একদিন পনের' কুড়ি মিনিট খবরের কাগজ বা কোনও বই পড়িয়া শুনাইতে হয়। বোস সাহেব বলেন—নিকর্ম্মা সময়টা কাটানই আমার উদ্দেশ্য, গল্প গুজবে সময় কাটে মন্দ কি? তোমারও ত এখন পড়াশুনা নেই, এক ঘণ্টার জায়গায় একটু বেশী দেরী হলেও বোধ হয় কিছু ক্ষতি হয় না।

আশ্চর্য্য হইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে লক্ষ্য করিতেছিলাম ঐশ্বর্য্যশালী খৃষ্টানের বাড়ী এই পিতাপুত্রীর ব্যবহার! আমি যেন তাঁহাদের পঁচিশ টাকা মাহিনার ভৃত্যমাত্র নহি,পরন্তু যেন কতকালের পরিচিত কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। নিজের দীনতা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের এ অতিরিক্ত দয়ায় আমি বড়ই লজ্জা বোধ করিতেছিলাম, কেমন জড়সড় আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকিতাম, সসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিতাম। মনে পড়িত—আমার ভবানীপুরের মনিব মহাশয়ের কথা, যাইতে মিনিট কয়েক দেরী হইলেই, বা একটু সকাল সকাল কাজ সারিয়া উঠিতে দেখিলে কিম্বা ছাত্রের সহিত পড়া ছাড়া অন্য বিষয়ে কোনও কথা বলিতে শুনিলে তিনি কিরূপ চোখ রাঙাইয়া কাজে জবাব দিবার ভয় দেখাইতেন!

দিন কয়েক আসা যাওয়ার পরেও আমার এই দ্বিধাকুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া একদিন বোস সাহেব বলিলেন—অমন জড়সড় ভাবে থাক' কেন ঘোষ?

এত দ্বিধাই বা কিসের ? তুমি, দেখ্‌ছি নিজের অবস্থাটার কথা খুব বেশী করেই ভাব'। জগতে গরীব বা বড়লোক হ'য়ে জন্মান কারও নিজের ইচ্ছা বা দোষ গুণের ওপর নির্ভর করে না, তবে, অর্থের মাপকাটি নিয়ে দশের কাছে নিজেকে ছোট ক'রে ধরাটা নিজের মনের সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় দেয়। সাধারণ লোকমাত্রেই প্রায় এইখানটায় ভুল ক'রে বসে। ঐশ্বর্য্যের কিছুই স্থায়িত্ব নেই। আজ তুমি আমায় বড়লোক মনে করছ' বটে, কিন্তু একদিন তোমার চেয়ে আমার অবস্থা কোন রকমেই ঈর্ষণীয় ছিল না। জ্ঞান হবার আগেই আমার মা-বাপ মারা যান, আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেউই ছিল না, পথে পথেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। অবশেষে বার বৎসর বয়সে এক পাদ্রীর দয়াতে স্কুলে ভর্ত্তি হলুম। কুড়ি বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করে এক মিস্‌নরীর সাহায্যে বিলেত যাই। বৎসর কয়েক সেখানে থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে ও নীলির মা'কে বিয়ে করে ভারতবর্ষে ফিরে আসি। মিস্ গ্রীন্‌লের কেউ ছিল না, তাঁর এক খুড়ী মারা যাওয়াতে আমার স্ত্রী কিছু অর্থ পান। দেশে এসে কল্‌কাতায় হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ করবার সময় এই অর্থই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই হাইকোর্টে আমার বেশ পসার জমে উঠ্‌ল'। এই সময় নীলিরও জন্ম হ'ল, মনে হ'ল আমার মত বুঝি জগতে কেউ সুখী নয়। কিন্তু দু'দিন না যেতেই হঠাৎ একদিন ভগবান আমার সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলেন—তিন বৎসরের নীলির সমস্ত ভার একা আমার ওপর রেখেই তার মা মারা গেলেন। সে আজ সতের আঠার বৎসরের কথা।

বৃদ্ধের কণ্ঠ কেমন সজল হইয়া আসিল, অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। মিস্ গ্রীন্‌লের চোখ দুটিও বোধ হয় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিলাম, এসব পুরাণ কথাতে যদি সুপ্ত ব্যথা জাগিয়াই উঠে তবে নিরর্থক তাহার পুনরাবৃত্তি কেন? সামান্য ভৃত্যের নিকট নিজের অতীত দিনের ইতিহাস ব্যক্ত করার কি দরকার বুঝিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে মিষ্টার বোস মুখ ফিরাইয়া আনিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—তাই বল্‌ছিলুম অর্থই শুধু মানুষের সুখ বা মহত্ত্বের পরিচয় দেয় না। হয়ত আমার চেয়ে, শৈশবে মাতৃহারা নীলির চেয়ে তুমি অনেক বিষয়ে সৌভাগ্যবান। নিজের জীবনে এ'টা আমি স্পষ্টই বুঝেছি অবস্থার বিপাকে প'ড়ে যদি কেউ অপরের অধীনে এসে পড়ে, তা হ'লে সেও যে সকলেরই মত, আমারই মত ভাগ্যের খেলার সামগ্রী মানুষ মাত্র, এ কথাটা ভুলে যাওয়া একেবারেই উচিত নয়। অদৃশ্য হস্তের দ্বারা চালিত হ'য়ে আজ যে আমি তোমার এতটুকুও সাহায্য-হেতু হ'তে পেরেছি সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।

মাথাটি ঈষৎ নত করিয়া বোধ হয় তিনি উপাস্যকে প্রাণের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন, মিস্ বোস অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন 'আমেন্'।

এবার হইতে জোর করিয়া কুণ্ঠাভাব ত্যাগ করিয়া ইঁহাদিগকে আপনার ভাবিবার ও কথায় কাজে সে ভাবের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রায় প্রতি রাত্রেই এখানে আহার করিতে আরম্ভ করিলাম, একমাস লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলাম, বাড়ীতে ত ইঁহারা হিন্দুর অখাদ্য কোনও কিছু টেবিলে আনিতে দেন না, অবস্থাপন্ন হিন্দু ঘরের মতই এখানে রাত্রে লুচি বা পোলাও ও মটন-কারী ইত্যাদিই প্রধান

আহার্য্য ছিল। প্রথম প্রথম আমাকে পৃথক টেবিলেই প্রচুর পরিমাণে ফল পাকড় দেওয়া হইত। অবশেষে একদিন নিজ হইতেই ইঁহাদের সহিত এক টেবিলে আহারে যোগ দিলাম। সেদিন মিস্ বোস প্রকৃতই খুব খুসী হইয়াছিলেন, নিজ হাতে বাছিয়া বাছিয়া আমার ডিসে খাবার তুলিয়া দিয়াছিলেন। বোস সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালীরই ছেলে আমি, ভাত রুটীর মায়া কোন দিনই ছাড়তে পার্লুম না. অন্ত কিছু খেলে আমার সয়ও না।

ঘনিষ্ঠতা দিনে দিনে বেশ বাড়িয়াই চলিল। সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা হাজির দিয়া চলিয়া যাইবার পরিবর্ত্তে এখন আমি যখন হউক আসিয়া যত ঘণ্টা সম্ভব এখানেই কাটাই। অন্য কাজকর্ম্ম আমার কিছুই ছিল না, মিস্ বোসেরও কলেজ বন্ধ—বেথুন কলেজে তিনি থার্ড ইয়ার বিএ ক্লাসে পড়েন।

গল্প করিয়াই বেশীর ভাগ সময় কাটিত। কোনও কোনদিন তিন জনে কেরম খেলা হইত; মিস্ বোস আমাকে বিলিয়ার্ড খেলা শিখাইতেন, বোস সাহেব মার্কারের আসনে বসিয়া হাসিতেন। যেদিন খবরের কাগজ পড়া হইত, পিতাপুত্রী কাগজে লিখিত জগতের ঘটনা-বলীর বিশদ সমালোচনা জুড়িয়া দিতেন। কোনও দিন বা কোন লঘুপাঠ্য গল্পের বই পড়িয়া সময় কাটিত। আর মাসের শেষ তারিখেই আমার এই সকল কার্য্যের পারিশ্রমিক পঁচিশটি করিয়া টাকা আমার পকেটে যাইতেছিল।

ধর্ম্মবিষয়ে বা হিন্দুসমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার অবস্থার উল্লেখ করিয়া ইঁহারা কোন কথাই তুলিতেন না। কথায় কথায় কোনও কথা

উঠিয়া পড়িলে দেখিতাম ইহারা ইচ্ছা করিয়াই কথার গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া দিতেন। ইহাদের উদারতায় মুগ্ধ হইলেও প্রথম প্রথম আমার যেন একটু কি আশঙ্কা হইত—কি জানি, নিজের আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে আঘাতে আঘাতে আহত প্রতিহত মতিগতি যদি এই স্নেহসদয় আকর্ষণে ভিন্নদিকে ফিরিয়া যায়! অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার জন্য খৃষ্টান মিসনরীদের প্রাণপাত চেষ্টা, নির্লোভ মহাপুরুষের নামে লোভ দেখাইয়া ভ্রান্ত নরনারীকে ভুল বিশ্বাস করাইবার জন্য বচনের ঘটা, সব ত অনেক দেখিয়া শুনিয়াছিলাম; তবে কি ইহারা আমাকে——ছিঃ, না, নিজের সন্দিগ্ধতায় এখন নিজেই লজ্জিত হইলাম। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহাদিগকে ত চার্চে যাইতে দেখিতাম না, বাড়ীতেও আর পাঁচটি সহধর্ম্মী বন্ধুবান্ধবের অবাধ সমাগম নাই, আহার বিষয়েও বাঙ্গালী হিন্দু হইতে বিশেষ স্বাতন্ত্রও চোখে পড়ে না। বিলাতী মেমের গর্ভে জন্মিলেও মিস্ বোসের চালচলনে দর্পিত বিলাস-চাঞ্চল্য ছিল না, কথাবার্ত্তা ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মতই স্নেহকোমল। একদিন লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিতে গিয়া ভিতরে বাঙ্গালী বেশে মিস্ বোসকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অপর কেহ মনে করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম, ভিতর হইতে মিস্ বোস হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—কি নরেনবাবু, আমাকে বাঙ্গালীর বেশে দেখে সত্যিই চিনতে পারলেন না, না হঠাৎ সামনে একটা খিচুড়ীভাব দেখে আঁৎকে উঠলেন?

—ওঃ আপনি, নমস্কার, আমি মনে করেছিলুম কোনও আত্মীয়া আপনাদের। বাস্তবিক বাঙ্গালীর বেশে আপনাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে! মনে মনে আমার কেমন একটা গর্ব্ব হচ্ছে।

কৃত্রিম বিনয়ে মাথাটা একটু নত করিয়া তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—Thank you kindly for your sweet flattery. সঙ্গে সঙ্গে জিভ কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন—এই যাঃ! বাঙ্গালিনী হ'য়ে ইংরেজী কথা বলে ফেল্লুম, এবার ত ভারী নিন্দে কর্বেন আপনি! আচ্ছা নরেনবাবু বাঙ্গালীর ফেমিনিন্ (স্ত্রী-লিঙ্গ) কি?—বাঙ্গালিনী, না বাঙ্গালী-স্ত্রী যেমন English woman (ইংরাজ-স্ত্রী)।

হাসিয়া বলিলাম—'বাঙ্গালী' নিজেই ফেমিনিন্ (স্ত্রী-লিঙ্গ) ম্যাস্কুলিনে (পুং-লিঙ্গে) 'বাঙ্গাল'।

উপহাস বুঝিতে পারিয়া মিস্ বোস অন্য কথা পাড়িলেন—আচ্ছা নরেনবাবু সত্যি ক'রে বলুন ত আমার এই কটা চুল বেয়াল চ'খেও কি বাঙ্গালীর মত দেখাচ্ছে? মেমের বেশেও দেখেছেন আমাকে, ঠিক কথা বলুন দেখি কোন্‌টা আমায় বেশী মানায়?

সমস্যার কথা বটে! দুই দিক রক্ষা করিয়াই বলিলাম—ও দু'টোতেই বেশ মানায় আপ্‌নাকে।

ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন—Flattery agaln, naughty boy! I ask which one suits me comparatively well (আবার খোসামদি দুষ্টু ছেলে! আমি না জিজ্ঞাস্ কর্লুম কোন্‌টার চেয়ে কোন্‌টায় বেশী মানায়)?

—তা' এখন কি ক'রে বলি। আপ্‌নি না হয় "প্যারাডাইস লষ্টখানা" আগা গোড়া মুখস্থ বল্‌তে পারেন, আমার মেমারী (মেধা) ত আর অত সার্প (তীক্ষ্ণ) না, এক সঙ্গে দু'টো মূর্ত্তিতেই আপনাকে পাশাপাশি না দেখ্‌লে কম্-পেয়ার (তুলনা) করি কি ক'রে বলুন।

—কি ঘোষ, কিসের কম্‌পেয়ার হচ্ছে?—সহাস্য মুখে বোস্ সাহেব অন্যদিন অপেক্ষা একটু দেরীতেই বেড়াইয়া ফিরিলেন।

মিস্ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখুন ত বাবা, আমি ওঁকে জিজ্ঞাস্ কর্লু্ম বাঙ্গালীর মত কাপড় চোপড় পর্লে না মেম সাজ্‌লে আমাকে বেশী মানায়, তার উত্তর উনি কি দিলেন জানেন বাবা? দুটোতেই নাকি আমাকে সমান মানায়। Undisguised flattery (স্পষ্ট তোসামোদি) না এটা?

আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বোস্ সাহেব বলিলেন—flattery (তোষামোদ) কেন? বেশ বুদ্ধিমানের মতই দু'কূল বাঁচিয়ে কথা বলেছে।

অভিমানে স্বর নাকে তুলিয়া মিস্ বোস বলিলেন—যান্, আপনিও ঐ সাইড্ (পক্ষ) নিলেন।

কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে, বোস সাহেব উপহাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—না মা, বাঙ্গালীর সাজেই তোমাকে বেশী মানায়, বাঙ্গালীর মেয়ে যে তুমি মা। এদেশে বাপের পরিচয়েই সন্তান নিজের পরিচয় দেয়, মা'য়ের পরিচয়ে না। বাঙ্গালীর মেয়ে তুমি, বাঙ্গালাদেশে তোমার জন্ম, বাঙ্গালার জলমাটীতে তোমার শরীর গড়া, তোমার মাও যে স্বামীর দেশকে নিজের দেশ ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। তাই না মেমের মেয়েদের মত সাহেব-মেম সমাজে মিশ্‌বার তোমার পূরো অধিকার থাক্‌লেও, বাঙ্গালীর মত ক'রেই তোমাকে আমি গড়ে তুলেছি। তাতে যে নিজের আমার আরও অনেকখানি স্বার্থ ছিল—বিপত্নিকের একমাত্র অবলম্বনটা পাছে একটুও স'রে যায় তাই তাকে প্রাণপণে

আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করেছি আমি। স্নেহান্ধ হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা স্বর্গীয় পিতা ক্ষমা করবেন আশা করি।

আরও একটা কথা, বাঙ্গালীর সাজে যদি তুমি বাঙ্গালীর মাঝে গিয়ে দাঁড়াও, তারা তোমায় টেনে একেবারে বুকে তুলে না নিলেও সস্নেহে প্রশংসার দৃষ্টি তুলে' তোমার দিকে চাইবে, কিন্তু মেমের মেয়ে তুমি মেম্ সেজে যদি সাহেব সমাজে মিশ্‌তে যাও, তা হলে তারা নাক সিঁটকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, মাঝখানে একটা গণ্ডি টেনে দেবে, তার মধ্যে আর বেশী নিকটে কিছুতে যেতে দেবে না। খৃষ্টান আমরা, আমরা জাতিভেদ জানি না বটে কিন্তু বর্ণভেদটা observe ক'রে (মেনে) চলা আমাদের মধ্যে খুবই সাধারণ। আমিও খৃষ্টান, আর Mr. Tomkin, butcher and dealer in live stocks, তিনিও খৃষ্টান, কিন্তু দু'জনের জন্য আলাদা চার্চ, গোরার চার্চে কালা যেতে পারে না। সাধে কি আর মা এই বুড়ো বয়সেও আমি চার্চে যাই না!

মিস্ বোস পিতার চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন এবার নত হইয়া পিতার কুঞ্চিত ললাটে নীরবে চুম্বন করিলেন। মিষ্টার বোস দুহাতে কন্যার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন—my child! তাঁহার নির্নিমেষ নয়ন স্নেহে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

যাক্ কি কথা বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম—হাঁ বলিতেছিলাম, মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা করিয়া মিস্ বোস মেম সাজেন, সাজিলে সত্যকার মেমই হয়েন বটে, তবুও অধিকাংশ সময় দেখিতে পাই তিনি, বাঙ্গালীর মত সেমিজ, ব্লাউজের উপর তাঁতের কাপড় পরেন।

ইহাদের ব্যবহার-আচরণে দিন দিন আমি স্বতঃই ইহাদের প্রতি

আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে ছিলাম। ইঁহাদের কথাবার্ত্তায়ও বিশেষ উপকৃত হইতেছিলাম, আমার এতদিনকার বই-পড়া সীমাবদ্ধ জ্ঞানের গণ্ডিটা এবার অনেক দিকে অনেকখানি প্রসার লাভ করিতেছিল। পিতা-পুত্রীতে কেমন উৎসাহে সাহিত্য আলোচনা করিতেন, সেক্ষপীয়র, ডান্‌টে, ভার্‌জিল প্রভৃতি বড় বড় কবি যাঁহাদের নাম মাত্রই এতদিন আমার শুনা ছিল, তাঁহাদের কাব্য বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে কত তর্ক ও মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। যেদিন বোস সাহেব না থাকিতেন, মিস্ বোস আমার কাছেই এই সব বড় বড় কথার অবতারণা করিতেন, আমার সঙ্কীর্ণ জ্ঞান অনুধাবন করিতে পারিত না। কিন্তু মিস্ বোস আমার অজ্ঞতায় অনুকম্পা দেখাইয়া বিরত না হইয়া বরং সোৎসাহে আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন।

(৩)

সহপাঠীর নিকট খবর পাইলাম, আজ পরীক্ষার ফল বাহির হইবে। তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বারভাঙ্গা বিল্‌ডিংএ উপস্থিত হইলাম। কতক্ষণ অপেক্ষার পর হলের দ্বার খুলিল, দুরুদুরু হৃদয়ে, অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ভিতরে ঢুকিলাম, দেখিলাম, আমার রোলের পাশে প্রথম বিভাগে পাশ করার চিহ্ন! বাহিরে আসিয়া প্রথমেই মনে হইল—বাড়ীতে খবরটা আগে দিয়া আসি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, আমার পরীক্ষার খবর শুনিবার জন্য বাড়ীতে কেহ ত উৎকণ্ঠিতভাবে

অপেক্ষা করিতেছে না, সুখবরে কে বা আনন্দ প্রকাশ করিবে! সেবার বেলা দুপরের সময় ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার ফল জানিতে পারিয়া আনন্দাতিশয্যে ছুটিয়া দাদার অপিসে খবর দিতে গিয়াছিলাম। দাদা পরম উদাসীনভাবে বলিয়াছিলেন—অপিসের কাজ ফেলে খবর জান্‌তে এখনই ছুট্‌বার কি দরকার ছিল, দুঘণ্টা পরে এম্নিই ত জান্‌তে পার্ত্তে।—তখন আমি দাদার অপিসেই অস্থায়ীভাবে চাকুরী করিতেছিলাম, পরীক্ষা শেষে দিন কয়েক পরেই দাদা আমাকে এখানে কুড়ি টাকা মাহিনায় বিল্‌-সরকারের কাজ জোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। আমি অপিস পলাইয়া 'পরীক্ষার ফল জানিতে গিয়াছি এই উপলক্ষ্য করিয়া দাদা সেদিন আমার বাড়াবাড়ি আনন্দে ভ্রূকুটী করিয়াছিলেন।

ডাকঘরে গিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লইয়া দেশে মা'কে লিখিলাম, তাঁর আশীর্ব্বাদে এবারও আমি পাশ করিয়াছি।

কি করিয়া পড়ার খরচ জুটাইব, কেমন করিয়া পাশ করিব, এই ভাবনাই এতদিন মনে প্রবল ছিল। পাশ করিয়াছি, খবর পাইয়া আজ আবার একটি নূতন দুর্ভাবনা মনে উঠিতে লাগিল—এবার আবার কি হয় কি জানি, পড়া ছাড়িতে ত আমার এতটুকুও ইচ্ছা নাই, তা সেজন্য আমাকে যত অসুবিধা-কষ্টই ভোগ করিতে হউক না কেন। কিন্তু এবার কি আবার আরও দুই বৎসর পড়িবার অনুমতি দিবেন দাদা?

ভাবিতে ভাবিতে, অন্যদিন অপেক্ষা আজ অনেক পূর্ব্বেই বোস সাহেবের বাংলোয় উপস্থিত হইলাম। বাহিরে মাধবী ও আইভি জড়িত একটি লৌহ-তোরণের পাশে দাঁড়াইয়া মিস্‌ বোস আপন মনে লতার নিম্নগামী ডগাগুলি বাঁকাইয়া উপরের দিকে তুলিয়া দিতেছিলেন; ডায়না

কোথায় খেলা করিতেছিল আমার সাড়া পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া কোলে উঠিবার জন্য লাফালাফি জুড়িয়া দিল। তাহাকে তুলিয়া লইয়া মিস্ বোসের নিকট গিয়া অভিবাদন করিলাম।

প্রতি-নমস্কার করিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—আজ যে বড় সকাল সকাল? এই একটু আগে বাবা বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন।

রুমালে হাত মুছিতে মুছিতে নিকটের লোহার বেঞ্চখানিতে নিজে বসিয়া বলিলেন—দাঁড়িয়ে কেন, বস' না।

মিস্ বোস বয়সে আমার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড়, আজকাল তিনি আমাকে 'তুমি' বলিয়াই সম্বোধন করেন। আমিও বেঞ্চের একধারে বসিলাম, কোলে বসিয়া ডায়না মুখ চাটিবার জন্য বিব্রত করিতে লাগিল, দুই হাত দিয়া তাহাকে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মিস্ হাসিয়া বেয়ারাকে ডাকিয়া কুকুর লইয়া যাইতে বলিলেন। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—সন্ধ্যা হ'য়ে এল, এখানে বস্‌বে, না ভেতরে যাবে?

অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—ঘরেই চলুন।

বেয়ারা ইতিপূর্ব্বেই ঘরের বিজলী বাতিগুলি জ্বালিয়া দিয়াছিল। দুজনে পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিলাম। মিস্ বোস বলিলেন—তোমায় আজ এমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন?

—কই না, অন্যমনস্ক কিসের?

—তবে অমন নির্ঝুম কেন, কি ভাবছ'?

—আজ আমাদের রেজাল্ট বেরিয়েছে।

—তোমাদের Result বেরিয়েছে?—আমার উৎসাহহীন মুখের

প্রতি লক্ষ্য পড়িতেই, হঠাৎ চুপ করিয়া গিয়া আমার হাতের উপর নিজের একখানি হাত রাখিয়া স-প্রশ্নদৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এমন স্নেহপূর্ণ সহানুভূতিটা আরও কয়েক মুহূর্ত উপভোগ করিয়া লইয়া বলিলাম—ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছি দেখলুম।

অমনি আনন্দে মিস্ বোসের মুখখানি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, একটা ঝাঁকানি দিয়া, সজোরে আমার করকম্পন করিতে করিতে বলিলেন—Hurrah, I congratulate you. Halloo! what selfishness to keep this happy news from me so long! (হুর্‌রে, এমন সুখবরটা এতক্ষণ আমায় দাওনি, আচ্ছা স্বার্থপর ত তুমি!) তা শুধু হাতে এসেছ' যে বড়, সন্দেশ কই?

—মেয়েরা কি আজকাল সন্দেশ খান্ নাকি?

—খান্ কি না খান্ সেটা এনে দেখলেই ত হ'ত। পাছে আমরা খেতে চাই তাই আগে থেকেই বুঝি মুখ অমন পেঁচা ক'রে রেখেছ'? সে হচ্ছে না, বেয়ারাকে দিয়ে সন্দেশ আনতে পাঠাও এখনি।

মুস্কিলের কথা! পকেটে যে আজ কিছুই নাই, কি দিয়া সন্দেশ কিনিতে পাঠাইব? বলিই বা কি করিয়া আমার কাছে একটি পয়সাও নাই? হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—আচ্ছা পেটুক ত আপনি, অত ব্যস্ত কেন, না হয় কালই সন্দেশ খাবেন।

আমার কথা কানে না তুলিয়া তিনি বেয়ারাকে ডাক দিয়া বলিলেন—ওসব কথায় পার পাচ্ছ না, কি কি আনতে দেবে বেয়ারাকে বলে পাঠিয়ে দাও।

সর্ব্বনাশ। শেষটা বেয়ারার সম্মুখেই অপদস্থ হইব! ঐ বুঝি বেয়ারা

আসিয়া পড়িল—ভিতরে ভিতরে আমি ঘামিয়া উঠিলাম। একবার মনে হইল মুখ ফুটিয়া সত্য কথাটা বলিয়া ফেলি, কিন্তু মুখ যেন কে চাপিয়া রাখিল। বেয়ারা আসিয়া বলিল—মিসিবাবা বোলায়া?

বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল, অস্থিরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম—আভি কুছ কাম্ নেই তুম্ যাও।

বিস্মিতভাবে মিস্ বোসের দিকে একবার চাহিয়া বেয়ারা আবার বাহির হইয়া গেল: দ্বারের দিকে চাহিয়াই বলিলাম—কি খাবেন বলুন, আমি নিজে গিয়ে আন্‌ছি।

কোনও উত্তর পাইলাম না, ফিরিয়া দেখিলাম, মিস্ বোস গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন, এতক্ষণের রহস্যময় হাস্যভাব এক মুহূর্ত্তেই কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। অপরাধ-কুণ্ঠিত স্বরে আবার বলিলাম—কি আন্‌ব' বলুন মিস্ বোস?

আমার দিকে না ফিরিয়াই এবার তিনি উত্তর করিলেন—থাকি জানি তা তারপর ফুলদানির ফুলগুলিকে নূতন করিয়া সাজাইতে ব্যস্ত হইলেন।

হায় এমন একটা তুচ্ছ বিষয় লইয়া ইঁহাকে অসন্তুষ্ট করিলাম! নিজের উপর আমার বড় রাগ হইতে লাগিল। বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইল, মিস্ বোস বাহিরের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মিষ্টার বোস ক্লান্তভাবে ঘরে ঢুকিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে তিনি বলিলেন—এই যে নরেন কতক্ষণ এসেছ'? গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম আজ, ফির্‌তে একটু দেরীই হ'য়ে গেছে। আসন গ্রহণ করিয়া কন্যাকে বলিলেন—আজ আমার সঙ্গে গঙ্গার ধারে

গেলে বেশ আমোদ পেতে মা। একা একা বসে এতক্ষণ আমার ওপর খুবই রাগ কর্চ্ছিলে নিশ্চয় ?

—না বাবা, আজও ত আমি ইচ্ছা করেই বেড়াতে যাইনি। তা ছাড়া মিষ্টার ঘোষও অনেকক্ষণ এসেছেন, সব সময়টা আমাকে একা থাকতে হয়নি।

'মিষ্টার ঘোস', 'এসেছেন'—বুঝিলাম মিস্ বোস সত্যই আজ আমার উপর রাগ করিয়াছেন। আজ আর আড্ডাটি ভাল করিয়া জমিল না। আমার পাশের খবর বা সন্দেশ লইয়া একটু পূর্ব্বে যে হাঙ্গাম হইয়া গিয়াছে, মিস্ বোস পিতার নিকট কোন কথাই তুলিলেন না। নিজেও আমি মুখ ফুটিয়া খবরটা দিতে পারিলাম না,যদিও বুঝিতে-ছিলাম, বোস সাহেবের মত হিতৈষীর নিকট এ সুখবরটা এখনই জানান উচিত।

আটটা বাজিল, হল ঘরে আহারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বোস সাহেব খাইবার জন্য আজ আর অনুরোধ করিলেন না ; মিস্ বোস ঘাড় বাঁকাইয়া একবার আমার দিকে চাহিলেন মাত্র। অনুতপ্ত বিষণ্ণ-চিত্তে আমি বাহির হইয়া আসিলাম।

---

(৪)

দাদা অপিসে বাহির হইবার পূর্ব্বে বলিলাম—এ মাসের ট্রামভাড়া, জলখাবারের টাকা চারটা আজ যদি দিয়ে দিতেন,—বিশেষ দরকার আছে।

তিনি বলিলেন—আজ তিন তারিখ হ'য়ে গেল, মাইনে পাওনি আজও?

—না, আজও ত তাঁরা দেন্‌নি।

—চাইতে পার না তুমি? তাঁদেরও বা কেমন বিবেচনা!

কি উত্তর দিব? মনে মনে ভাবিলাম—তাঁদের কেমন বিবেচনাই বটে।

আমার অমিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া অবশেষে দাদা বলিলেন—তোমার বৌ'দিকে বলে যাচ্ছি, দু' টাকা চেয়ে নিও, মাইনে পেলে বাকী দু' টাকা পাবে তখন।

পকেটে কিছু ছিল না বলিয়া কাল বড়ই অপদস্থ হইতে হইয়াছিল, কারণ না বুঝিয়া মিস্ বোস অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আজকাল ওখানে যে পঁচিশ টাকা পাইতাম সমস্তই দাদার হাতে আনিয়া দিতাম, তাহা হইতে, হিসাব করিয়া দাদা আমাকে দৈনিক তিন পয়সা করিয়া একমাস, জলখাবারের এক টাকা সাড়ে ছয় আনা (১।৵১০) ও ছাব্বিশ দিনের একবারের ট্রাম ভাড়া দুই টাকা সাত আনা (২।৶০) মোট ৩৸১০

তিন টাকা সাড়ে তের আনা,—চার টাকা করিয়াই দিতেন। এখন কলেজের মাহিনা দিতে হয় না। তবুও এই চার টাকা ত মাসের দশদিন না যাইতেই কেমন করিয়া কোথা দিয়া খরচ হইয়া যায়।

বৈকালে টাকা দুইটি পকেটে লইয়া বাহির হইলাম, ইচ্ছা আজ যাইবার পথে সন্দেশ কিনিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু পথে আসিয়া কল্যকার সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার মনে পড়িতে কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, আজ কি করিয়া নিজেই সন্দেশ হাতে ঢুকিব! তাহা অপেক্ষা বরং ভিতরে ঢুকিবার পূর্ব্বে বাগানের মালির কাছে টাকা দিয়া সন্দেশ আনিতে বলিলেই চলিবে।

ফটকের কাছে পৌঁছাইয়া দেখিলাম, খান্‌সামা ফটকে বসিয়া দারবানের সহিত গল্প করিতেছে। আমাকে ঢুকিতে দেখিয়া খান্‌সামা খবর দিল—সাহেব ও মিসিবাবা, হাওয়া খাইতে গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম মালি কোথায়? সে বলিল—মালি বুঝি বাজারে সওদা করিতে গিয়াছে।

ভিতরে ঢুকিয়া বাগানের একখানি বেঞ্চে বসিয়া মালির শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বোধ হয় পনের মিনিট অতীত হইল, কিন্তু মালির দেখা নাই, খান্‌সামাকে পাঠাইব কি ভাবিতেছি এমন সময় বোস সাহেবের ফিটন ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আমাকে অতিক্রম করিয়া গাড়ী গিয়া গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে দাঁড়াইল। মিস্ বোসকে নামাইয়া দিয়া সহিস দরজা আবার বন্ধ করিয়া দিল। নিকটে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতে বোস সাহেব গাড়ীর উপর হইতে বলিলেন—সাতটার সময় চৌরঙ্গীতে এক সাহেবের

সঙ্গে আমার এন্‌গেজমেণ্ট আছে, নীলিকে পৌঁছে দিতে এসেছিলুম। আটটার আগেই ফিরব', থাক্‌ছ ত তুমি ততক্ষণ?

—আজ্ঞা হাঁ, আপনি না ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌ব।

—আচ্ছা ভিতরে যাও, তোমরা ততক্ষণ দুজনে গল্পসল্প করগে, আমি ঘুরে আসি, পৌণে সাতটা বাজে, চল কোচ্‌ম্যান্।

গাড়ী বাহির হইয়া গেল। মিস্‌ বোস্‌ তখনও সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। আরও একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, ঈষৎ শিরসঞ্চালন করিয়া তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন—ভিতরে এসে আপনি একটু বসুন, আমি পোষাক ছেড়ে আস্‌ছি।

আমার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি কতক্ষণ বাহিরেই ইতস্ততঃ পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আজও মিস্‌ বোসের রাগ পড়ে নাই—মনের কোনখানে অস্বস্তি ঠেকিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম টেবিলের সম্মুখে একখানি খোলা বইয়ের উপর মুখ নত করিয়া মিস্‌ বোস বসিয়া আছেন, যেন নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ-নিরত। প্রথমে আমার আগমন বোধ হয় তিনি জানিতে পারিলেন না, মিনিট খানেক পরে, হঠাৎ যেন আমার উপস্থিত জানিতে পারিয়া বইয়ের উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—বসুন।

কেন, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে,—প্রাণে বড় ব্যথা বাজিল, কতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াই রহিলাম। তবুও মিস্‌ বোস আর একটি কথাও বলিলেন না, একবার চাহিয়াও দেখিলেন না, আমার অস্তিত্ব যেন তিনি বইয়ের পাতায় চাপা পড়িয়াছে।

সহসা তাঁহার পশ্চাতে গিয়া চেয়ারের পিঠের উপর হাত রাখিয়া ব্যথিত ও অনুতপ্ত স্বরে বলিলাম—মাপ করুণ আমায় মিস্ বোস্। সত্যই কাল বড় অন্যায় হ'য়ে গিয়েছিল, সেই থেকে আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে রয়েছেন, এবার আমায় ক্ষমা করুণ দয়া ক'রে।

ভাবহীন নীরব দৃষ্টি তুলিয়া মিস বোস কয়েক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীর স্বরে বলিলেন—বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

—তবুও ক্ষমা কর্লে'ন না? কিন্তু কাল যে কি কারণে আমি অমন আচরণ করেছিলুম, জান্লে আপনি নিশ্চয় রাগ কর্ত্তে পার্ত্তেন না।

—কি ক'রে জানব বলুন, আমি ত আর আপনার ব'ন বা আপনার কেউ নই যে আমার কাছে আপনি কোন কথা গোপন কর্ত্তে চাইবেন না?

—আমার যে নিজের ব'ন নেই মিস বোস! বিশ্বাস করুন এই তিন মাসেই আপনাকে আমি নিজের জেষ্ঠা ভগিনী বলে ভাব্তে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি।

—তা বৈকি, সেই জন্যেই বুঝি কাল একটা সামান্য কথা গোপন কর্ত্তে অত ব্যকুল হতে হয়েছিল!

—সত্য বল্ছি, কোথা থেকে একটা দুর্ব্বলতা এসেছিল, ইচ্ছা ক'রেও বলতে পারিনি—আমার কাছে একটা পয়সাও তখন ছিল না। এখন বুঝছি বড় অন্যায় করেছি, অনুতাপ হচ্ছে।

কি জানি চোখের কোণে বুঝি জল জমিয়া উঠিয়াছিল। মিস্ বোস উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া

বলিলেন—ছিঃ, নরেন, ছেলেমি করো না। রাগ করবার অধিকার দিয়েছ, রাগ করেছিলুম। এখন ত রাগ সেরে গিয়েছে, আর মিছে অত দুঃখ করো না ভাই। চল বস্‌বে এস।

একটা সামান্য সূত্র ধরিয়া কাল যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল আজ তাহা এমন দৃঢ় বন্ধন হইয়া উঠিবে আশা করি নাই। অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব একটা উৎকট আনন্দে সমস্ত হৃদয়খানি মুখর হইয়া উঠিল। এই আঠার বৎসর ব্যাপী জীবনে এমন স্নেহ, মধুর সহানুভূতি, সহোদরার সরস ভালবাসা ইতিপূর্ব্বে কখনও উপভোগ করি নাই। আজ প্রাণের আনন্দ, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কি কথায় ব্যক্ত করি!

আমাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য মিস বোস বলিলেন—আমার একটা কাজ ক'রে দেবে নরেন? ছুটীত শেষ হ'য়ে এল, কুড়েমি ক'রে ফিলসফির নোটগুলো এখনও কপি করা হ'য়ে উঠ্‌ছে না আমার দ্বারা। বাবা যতক্ষণ না আসেন খানিকটা তুমি লিখে দাও না।

মিনিট কুড়ি পরে বোস সাহেব বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন পড়িবার-ঘরে তাঁহার নীলিমা একখানি খাতা হইতে ডিক্টেট করিয়া যাইতেছেন, আমি আর একখানি খাতায় কপি করিতেছি।

একটা পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত পৌঁছাইলে মিস বোস খাতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া বলিলেন—খুব শীগ্‌গীরই ত ফির্‌লেন বাবা!

পিতাকে উত্তর করিবার অবসর না দিয়াই একবার আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিলেন—সন্দেশ খাওয়া নি'য়ে কাল ভাই ব'নে খুব ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল, এই একটু আগে আবার ভাব হয়েছে। তারই শাস্তি স্বরূপ নরেনকে একটু খাটিয়ে নিচ্ছিলুম।

বোস সাহেব হাসিয়া বলিলেন—কিরে তোরা দুটোতে বুঝি বুড়োকে লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ খাস্ ?

—না বাবা তা না, নরেন ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ হয়েছে, কাল তার খবর বেরিয়েছে কিনা তাই ওর কাছে সন্দেশ খেতে চেয়েছিলুম, তা—

সশব্দে আমার পিঠের উপর চপেটাঘাত করিয়া মিষ্টার বোস্ বলিলেন—আরে, ভারি দুষ্টু ত তোরা, আজ দু'দিনের মধ্যে তোরা কেউই আমাকে এ খবরটা দিস্ নি ? ওরে, ও মংরু—

তাড়াতাড়ি পকেট হইতে গোটা কয়েক টাকা বাহির করিয়া মংরু খান্সামার হাতে দিয়া বলিলেন—যা ভাল সন্দেশ কিনে নিয়ে আয় জল্দি। সন্দেশ না খেলে, না খাওয়ালে আর কিছুতেই যে বাঙ্গালীর আনন্দ প্রকাশ করা হয় না।

খান্সামা সন্দেশ কিনিতে দৌড়াইল। আমি সলজ্জ কৃতজ্ঞভাবে পাশের চেয়ারখানায় আবার বসিয়া পড়িলাম। মিস্ বোস বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

---

(৮)

জুলাই মাসের প্রথমে কলেজ খুলিতেই ছাত্রেরা ভিড় করিয়া দলে দলে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। দাদাকে বলিলাম—এই বেলা ভর্ত্তি না হলে, পরে আর সিট্ পাওয়া যাবে না।

দাদা চুপ করিয়াই রহিলেন। বলিলাম—সিটি কলেজে admission fee লাগবে না ; সেখানেই ভর্ত্তি হব।

তবুও কোন উত্তর নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া এবার আসল বক্তব্যটা বলিয়া ফেলিলাম—ভর্ত্তি হতে বার টাকা লাগ্‌বে।

—বি এ পড়ে কি চতুস্পদ হবে শুনি? সব বিষয়ে নিজের অবস্থা মত চলাই উচিত, কত ধানে কত চাল সে হিসেব ত রাখ্‌তে হয় না এখনও। কিন্তু দাদা কি চিরদিন তোমাদের ভারই বইবেন, কেন এমন কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি? তোমার চেয়ে অনেক কম বয়সেই যে আমাকে লেখা পড়া, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে সংসারের ভার ঘাড়ে নিতে হয়েছিল। মা ত আমার একার মা না, দেশের বাড়ী ঘরগুলো সব প'ড়ে ঝ'ড়ে মাটী হয়ে যাচ্ছে, নিজে থেকে এসব গুলো এখনও না বুঝলে কাজেই বল্‌তে হয়।—নিজে আমি তোমার কাছে সিকি পয়সারও প্রত্যাশা রাখি না। তখন চাক্‌রী না ছাড়্‌লে এতদিনে কোন্ না চল্লিশ—পঞ্চাশ টাকা মাইনে আন্‌তে পার্ত্তে। বি এ পড়ে কি রাজা হবে?

পড়্‌তে চাও পড় গিয়ে, কিন্তু মনে থাকে যেন গেল বারের মত

এবার আর "ছেলে পড়ান' নেই, কলেজের মাইনে দিতে পাচ্ছিনা" এ সব কাঁদুনী গাইতেও পাবেনা, তা আগে থেকেই সে কথা বলে রাখ্ছি। এখনই ত সুরু হয়েছে, ভর্ত্তি হ'তে বার টাকা লাগ্বে। অত টাকা এখন আমার কাছে নেই।

আপিসের বেলা হইয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

আই এ পড়ার সময় একবার মাস দেড়েক টিউসনি ছিল না, কোথাও টাকার যোগাড় করিতে না পারিয়া বৌদিকে দিয়া দাদার কাছে কলেজের মাহিনাটা চাহিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম পরীক্ষার পর তিন মাস চাকরী করিয়া দাদার হাতে ষাট টাকা দিয়াছিলাম, এখন এক মাসের কলেজের মাহিনা দাদার কাছে চাহিলে পাইব। সেবারও কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময় বাহির হইতে টাকা ধার করিয়া ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, ইচ্ছা করিয়াই দাদার কাছে চাহি নাই, মা'কে লিখিয়া, বৌদির কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ও আরও পাঁচজনকে দিয়া দাদাকে অনুরোধ করাইয়া, এমন কি কয়েক দিন সত্য সত্যই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, তবে চাকরী ছাড়িবার, ও কলেজে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি পাইয়াছিলাম; ভর্ত্তি হইবার টাকা চাহি নাই— কি জানি আবার কি হাঙ্গাম বাঁধিবে! কিন্তু সেদিন নিরুপায়ে পড়িয়া তাঁহার নিকট কলেজের মাহিনা চাহিয়া, টাকা ত পাই-ই নাই উপরন্তু অনেক কথা শুনিতে হইয়াছিল।

এতদিন পরে আজ আবার সেই কথাটারই উল্লেখ করিয়া অকারণ গঞ্জনা দিতে, দাদার প্রতি সমস্ত অন্তরটা হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠিল, মনে

হইল বলি—গত তিন মাস যে পঁচিশ টাকা করিয়া তাঁর হাতে দিয়াছি, এই ত এখনও পাঁচদিন হয় নাই, পঁচিশ টাকা দিয়াছি—তাহা হইতে কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য বারটি টাকা চাহিবার আমার যথেষ্টই অধিকার থাকিতে পারে। ধার, ধার, ধার করিয়া টাকা সংগ্রহ করিব, কিন্তু ধারই বা কে দিবে বার বার, শুধিবই বা কি করিয়া? যা'ক অনেকখানি ব্যথা পাইলেও কখনই তাঁর মুখের উপর উত্তর করিতে পারিতাম না, আজও সাহস হইল না।

স্নান আহার করিতে ইচ্ছা হইল না, তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম—দেখি যদি টাকার যোগাড় করিতে পারি। কাহার কাছে যাইব, শচীশের কাছে এখনও যে আমার তিরিশ টাকা ধার! না খাইয়া ট্রামে না গিয়া আমাকেই ত ধার শোধ করিতে হয়।

সমস্ত দিন ঘুরাঘুরি করিয়াও কোথাও টাকার যোগাড় হইল না, শচীশের বাড়ী গিয়া শুনিলাম, সে বাহিরে আত্মীয় বাড়ী গিয়াছে ফিরিতে এখনও তিন চারি দিন দেরী হইবে। বাড়ী ফিরিতে রুচি হইল না, আরও কতক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তারপর বেলা পড়িয়া আসিলে বোস্ সাহেবের ওখানে উপস্থিত হইলাম।

বেয়ারা বলিল গতরাত্রে সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, অনেক দিন পরে পুরাতন বাতের ব্যথা আবার চাগাইয়াছে। ভিতরে গিয়া তাঁহার শয্যা পার্শ্বে বসিলাম। মিস্ বোস্ একটু পূর্ব্বে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। একথা সে কথায় কয়েক মিনিট কাটিবার পর বোস্ সাহেব বলিলেন—আজ একটু কিছু প'ড়ে শোনও আমাকে।

লাইব্রেরী ঘর হইতে মাসিক পত্র ও খবরের কাগজ আনিবার

জন্য উঠিয়া গেলাম। ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম মিস্ বোস পিতার পায়ের কাছে বসিয়া পায় মালিস করিতেছেন। শিয়রের দিকে একখানি চেয়ারে বসিয়া প্রথমে খবরের কাগজ খানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

মিনিট কুড়ি না যাইতেই বোস সাহেব ক্লান্ত ভাবে বলিলেন—আর থাক এখন, আমার যেন একটু ঘুম আস্‌ছে, মালিশটায় যন্ত্রণা অনেক নরম পড়েছে; তোমরা যাও খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে।

বাহিরে আসিয়া মিস্ বোস বলিলেন—পালায়ো না যেন, পড়ার ঘরে একটু বস, আমি হাতটা ধুয়ে আস্‌ছি এখনি।

দুশ্চিন্তা ও সমস্ত দিন অনাহার, শরীরটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। জানালার পাশে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলাম। কোথাও যখন টাকার যোগাড় হইল না ভাবিয়াছিলাম বোস সাহেবকে বলিলেই তিনি নিশ্চয় আমার মাহিনা হইতে টাকাটা আগাম দিবেন। কিন্তু তিনিও আজ আমার দুর্ভাগ্যক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, কবে সুস্থ হইবেন—পদ-শব্দে ফিরিয়া দেখিলাম মিস্ বোস ঘরে ঢুকিলেন।

—বাবার খাবার ব্যবস্থাটা ক'রে দিয়ে আস্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গেছে। হাঁ এবার বল'ত নরেন, আজ তোমার কি হয়েছে এমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? কোনও অসুখ বিসুখ হয় নি ত?

—না সে সব কিছু না, তবে স্নান করিনি আজ, রোদেও সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি হয়েছে তাই বোধ হয় অমন দেখাচ্ছে।

—শরীর ভাল আছে, তবে স্নান করনি কেন? রোদে এত ঘোরা ঘুরিরই বা কারণ কি?

চুপ করিয়া রহিলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে মিনিট খানেক চাহিয়া থাকিয়া মিস্ বোস বলিলেন—স্নান না করেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলে, খাওয়াও হয়নি সমস্ত দিন তা' হলে?

কি বলি?—হাঁ, না; খেয়েছি আমি—

বিশ্বাস হইল না, আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টে আমার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিয়া লইয়া বলিলেন—রাত্রে ত আর স্নান হবে না, যাও, মাথাটায় একটু জল দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এস চট্ করে।

দ্বিরুক্তি করিবার অবসর না দিয়া তিনি চঞ্চল পদে বাহির হইয়া গেলেন। স্নান না করার জন্য বাস্তবিকই শরীরটা বড়ই খারাপ বোধ হইতেছিল, উঠিয়া পাশের বাথ্রুমে ঢুকিলাম। মাথায় ও চোখে মুখে খানিকটা জল দিতে আঃ! শরীর যেন এতক্ষণে একটু ঠাণ্ডা হইল।

হলঘর হইতে মিস্ বোস ডাকিলেন। ইতিমধ্যেই টেবিলের উপর খাবার আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল। পাশে দাঁড়াইয়া মিস্ বোস্ প্রথমে আমার খাবার ভাগ করিয়া দিলেন, আমি খাইতে সুরু করিলে তবে তিনি আহারে বসিলেন।

আহার শেষ হইল, খান্সামাকে টেবিল পরিস্কার করিতে বলিয়া মিস্ বোস আবার পড়িবার ঘরে ঢুকিলেন। সমস্ত দিন উপবাসের পর এখন গুরুভোজন করিয়া অবসন্নভাবে একখানি আরাম কেদারায় ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মিস্ বোস জানালায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৈকাল হইতেই মেঘলা মেঘলা করিয়া ছিল; কয়েকবার

বিদ্যুৎ চমকাইল। জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া মিস্ বোস পাশের চেয়ারখানিতে বসিলেন। কতক্ষণ পরে বলিলেন—কি হয়েছিল আজ তোমার?

সোজা হইয়া বসিয়া বলিলাম—কি হবে, কিছুই ত হয় নি?

ব্যথিত তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—আজও তুমি আমার কাছে সব কথা বল্‌তে লজ্জা কর নরেন?

তাঁহার এ অভিমানপূর্ণ স্বর প্রাণে গিয়া কেমন বাজিল। হঠাৎ মুখ খুলিয়া গেল—আজকার ঘরের লোকের ব্যবহার, আমার বি এ পড়ায় দাদার অনিচ্ছা, ও কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার দেরীর কারণ সমস্তই অকপটে তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম।

মিস্ বোস নীরবে শুনিয়া গেলেন, তাহার পরেও কোন কথা বলিলেন না। নিজের দুর্ভাগ্যের কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়া আমি লজ্জিত ভাবে দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘরের কথা, নিজের দুঃখের কাহিনী এমন করিয়া প্রকাশ করা বোধ হয় ভাল হইল না, মিস্ বোস নিশ্চয় কি মনে করিতেছেন!

কতক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মিস্ বোস বলিলেন—নরেন, সত্যই কি তুমি আমাকে ব'নের মতই মনে কর?

এ কথা কেন? বলিলাম—তা' না হ'লে কি এত আব্দার কর্ত্তে পার্ত্তুম, না এমন ক'রে আপনাকে বিরক্ত কর্ত্তে সাহস হ'ত?

—তাই কি? বোধ হয় না।

ব্যথিত ভাবে বলিলাম—হঠাৎ এ সন্দেহ কেন?

—না সন্দেহ না, জিজ্ঞাস্ কর্চ্ছিলুম এম্নি।

একটু থামিয়া বলিলেন—এ পর্য্যন্ত বাইরের কারও সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্‌বার সুযোগ হয়নি বলেও বটে, আর, কি জানি কেন, তোমার ওপর প্রথম থেকেই কেমন একটা স্নেহ করবার, তোমাকে আপ্‌নার করবার ইচ্ছা হয় বলেও বটে, তোমার কথা আজ কাল আমি খুব বেশী করেই ভাবি। তোমারও মনের ভাব সে রকম কিনা তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম।

আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল, বিচলিত কণ্ঠে বলিলাম—কি ক'রে আপ্‌নাকে বিশ্বাস করাব মিস্ বোস, আপনার এ করুণা, অসহায় অভাগার প্রতি এমন স্নেহমাখা ব্যবহারে আমার প্রাণে কতখানি কৃতজ্ঞতা, কতখানি ভক্তি উছ্‌লিয়ে উঠ্‌ছে! আমার প্রাণও যে গোড়া থেকেই আপনার স্নেহ লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। জ্ঞান হ'য়ে অবধি বড় অভাগা আমি, এমন সদয় ব্যবহার এতখানি স্নেহ আর কারও কাছে যে কখনও পাইনি আমি। মা আছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্নেহ উপভোগ করবার আমার কোনদিনই তেমন সুযোগ ঘটে নি; জন্মের কয়েক মাস পরেই বাবা মারা গিয়েছিলেন, শুনেছি এই "বাপখেগো" শিশুটির প্রতি মা'য়ের আমার কেমন অশ্রদ্ধা ভাব দেখা গিয়েছিল, অবশ্য অন্তরে তাঁর মাতৃস্নেহের ধারা সত্যই শুকিয়ে যায়নি। জ্ঞান হ'তেই বিদেশে এক দূর আত্মীয়ের দয়ার ওপর নিক্ষিপ্ত হলুম—তাঁদের গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে একটা ফ্রি এনট্রান্স্ স্কুলে আমাকে ভর্ত্তি করান হ'ল। পরের বাড়ীতে থেকে, সুদীর্ঘ তিন মাইল পথ হেঁটে—রোদ-বর্ষায় ছাতা ছিল না, পায়ে এক জোড়া জুতা জুটত না, মনে আছে অনেক বয়স পর্য্যন্তই গায়ে একটা

জামা দিতে পাইনি, একখানা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে—স্কুলে যাতায়াত কর্ত্তুম্। যেদিন বড় কষ্ট হ'ত, মায়ের জন্য, পরিচিত সঙ্গীদের কথা মনে প'ড়ে মন কেমন ক'র্ত্ত, পথের ধারে গাছ তলায় ব'সে খুব খানিকক্ষণ কাঁদ্‌তুম।

তার পর বড় হলুম, নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে শিখ্‌লুম। এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষা দিতে কল্‌কাতায় এলুম। বৎসর খানেক পূর্ব্বে দাদা কল্‌কাতায় বাসা ক'রে স্ত্রী কন্যাদের নি'য়ে এসেছিলেন। তাঁর বাসায় এসে, দিন কয়েক না যেতেই বুঝ্‌লুম—যাক্ সে সব কথা। জগতের কা'কেও এ স্নেহ-পিপাসী প্রাণের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দিয়ে অভিসেক কর্‌বার সুযোগ পাইনি। অভাগার প্রতি আপনার দয়া ও স্নেহের পরিচয় পেয়ে' আশৈশবের পুঞ্জীভুত আবেগে আমার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আপনার পায় অর্ঘ দিয়েছি। সন্দেহ কর্‌বেন না মিস্ বোস, এর ভেতর এতটুকুও কৃত্রিমতা নেই।

প্রাণের আবেগে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম মিস্ বোসের আঁখিপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, মনে হইল তাঁহার মুখের কোন্‌খান্‌টিতে কিসের একটা জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হইতে লাগিল উঠিয়া গিয়া এই মহিয়সী স্নেহমূর্ত্তির পায়ে লুটিয়া পড়ি।

বার দুই কাসিয়া মিস্ বোস ভার ভার গলায় বলিলেন—চল, বাবার বোধ হয় এতক্ষণে ঘুম ভেঙ্গে থাক্‌বে, তাঁর খাবার সময় হ'ল। তোমারও রাত হ'য়ে যাচ্ছে।

চেয়ার হইতে উঠিয়া তিনি ধীর পদে অগ্রসর হইলেন।

---

(৬)

কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি। সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিবার সময় মিস্ বোস্ দু'খানি নোট হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন—কালই কলেজে ভর্ত্তি হয়ো।

অবশিষ্ট টাকা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে গেলে তিনি বলিলেন—থাক্ না তোমার কাছে, বই কিন্‌তে আর কত দরকার হয়, কাল মনে ক'রে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও।

ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিলাম—আমার ত বই কিন্‌বার দরকার হবে না, এ টাকাটা আপনিই রাখুন।

—বই কিন্‌বার দরকার হবে না! মানে?

হাসিয়া বলিলাম—মানে আর কি? ওটা ফাঁকি দিয়েই এ ক'বছর চালিয়ে আস্‌ছি, গেলবারে ত নিজে একখানাও বই কিনি নি, এবারেই বা কিন্‌ব কেন?

—বই কিন্‌বে না, পড়্‌বে কি ক'রে?

—কেন? এতদিন ক্লাসের ছেলেদের বই ধার ক'রে পড়্‌তুম, এবার আপনার বই নিয়ে পড়ব, কোর্স ত কিছুই বদ্‌লায় নি এবার, তা ছাড়া ইচ্ছে করেই ত আমি আপনার সাবজেক্ট গুলো নিয়েছি।

—হুঁ, সে অসুবিধে হবে, কিনেই নিও তুমি।

—কেন, আপনার বই পড়্‌তে দেবেন না? তা আপনার যদি অসুবিধে হয়, না হয় এবারও—

বাধা দিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিলেন—আমি কি তাই বল্‌ছি নাকি? দেখ্‌তে পাওনা কত পড়ি আমি?

—আচ্ছা বই কিন্‌তে হয় পরে কেনা যাবে, এইত সবে দু'চার দিন লেকচার আরম্ভ হয়েছে। টাকা গুলো আপনিই এখন রাখুন, পরে দরকার হ'লে চেয়ে নেব'। হাঁ, ডাক্তার এসেছিলেন আজ? কিছু না বল্‌লেও আজ যেন পায়ের ব্যথাটা বেশীই বোধ কর্‌ছেন বলে মনে হ'ল।

—ডাক্তার ত সকালেই এসেছিলেন। নিজের কষ্টের কথা বাবা কোন দিনই আমাকে জান্‌তে দেন না, পাছে আমি ভাবি, কষ্ট করি। আগে আগে ক'বার ত তাঁর বাত হয়েছিল, দু পাঁচ দিনেই নরম পড়ে যেত, কিন্তু এবার এত দেরী হচ্ছে কেন বুঝ্‌ছি না।

—অন্য কাকেও দেখালে হয় না, ডাক্তার বাবু কি বলেন?

—তিনি ত একই কথা বলেন,—নরম পড়্‌বে, বুড় মানুষ একটু দেরীই হবে। অন্য কাকেও ডাক্‌তে বাবা রাজি নন্।

ইতি পূর্ব্বেই আহারাদি সারা হইয়া গিয়াছিল, মিনিট কয়েক পরে বিদায় লইলাম।

দিন কয়েক পরে, সকাল বেলা গামছায় বাঁধা বাজার লইয়া সবে বাড়ী ঢুকিয়াছি, দাদা কলতলায় স্নান করিতেছিলেন, আমাকে বলিলেন—দেশ থেকে হরিখুড়ো চিঠি দিয়েছে—মা'র নাকি বড় অসুখ, আমাকে যাবার জন্য লিখেছে। চাকরী ফেলে, এদের এখানে একা রেখে এই দণ্ডেই আমি যাই কি ক'রে? সাড়ে দশটার ট্রেণে তুমিই যাও এখন, কেমন অবস্থা দেখ খবর দিও সেই মত ব্যবস্থা করা যাবে।

আমারও ত এই সবে দিন পনের কলেজে পড়া আরম্ভ হইয়াছে, তা ছাড়া বোস্ সাহেবের অনুমতি আবশ্যক, আমিই বা এই মুহূর্ত্তে কি করিয়া যাই? কিন্তু মা'য়ের অসুখ, প্রাণটা যে কেমন ব্যাকুল হইতেছে। নাঃ, যাইতেই হইবে আমাকে। দাদার কথায় কোনও প্রতিবাদ করিলাম না। ভাবিলাম, পড়ার ক্ষতি হইবে, কি করিব! বোস্ সাহেব অসুস্থ—কিন্তু আমার মা যে দেশে অসহায় অবস্থায় অসুখে পড়িয়াছেন! দেশে পৌছাইয়া আজই মিস বোসকে সকল কথা লিখিয়া জানাইলেই চলিবে।

মিনিট দশ পরে বাজারের হিসাব দিবার জন্য উপরে ডাক পড়িল। শাকের দাম, মাছের দাম কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া দাদা বলিলেন—টাকা কড়ি কিছু আছে তোমার কাছে?

আমার কাছে টাকা থাকিবে কোথা হইতে? বলিলাম—না।

—এখন মাস কাবারের সময় আমারও টানাটানি, এই পাঁচটা টাকা নিয়ে যাও, ট্রেন ভাড়াটা তোমার কাছথেকেই দিও, পরে দেখা যাবে। হ্যাঁ, তোমার ত ধারে হাতী কেনা স্বভাব, নিজেদের অবস্থা বুঝে খরচ পত্তর করো, সেখানে আবার যেন ধার ধোর ক'রে নাবাবী দেখিয়ো না। মাসের প্রথমেই মাকে চার টাকা পাঠিয়েছিলুম, তার দরুণ মা'র কাছেও কিছু থাকতে পারে। এ টাকা থেকে যা খরচ পত্তর করবে একখানা কাগজে টুকে রেখ। তা যাও আর দেরী করো না, চট্ করে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড, সাড়ে ন'টা ত বাজে।

টাকা পাঁচটি মাছুরের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া নীচে আসিলাম।

আমার কাছে টাকা আছে, তাহা হইতে ট্রেন ভাড়া দিয়া যাইব, এই পাঁচটি টাকা দিয়া মায়ের চিকিৎসা করাইব, পথ্য জোগাইব—নিখুঁত হিসাব, কি সুন্দর বিবেচনা দাদার! নিজের কন্যাদের ত একটু সর্দ্দি হইলেই, গ্লুকস, সিরাপ, মালিসের ঔষধ ইত্যাদিতে কত পয়সাই তিনি খরচ করেন দেখি নাই কি? মায়ের চিকিৎসার জন্য মাত্র পাঁচটি টাকা—কিন্তু আমার নিজেরই যখন সামর্থ নাই, তখন কাহাকেও কিছু বলিবার আমার অধিকার কোথায়?

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে পৌঁছাইয়া দেখিলাম, বাড়ীর পাঁচীলের দ্বার বন্ধ, ঠেলিতে 'ক্যঁচ' শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। প্রায় আড়াই বৎসর পরে আজ বাড়ী ঢুকিলাম। ভিতরে দুইখানি মাটীর ঘর ও ছিটে বেড়ার একখানি রান্না ঘর ছিল। উঠানে পা দিয়াই বুঝিলাম অনেক দিন ঝাঁটু পড়ে নাই, চালের গোলপাতার গুঁড়া ও খড়কুটা উড়িয়া পড়িয়া উঠানের চারিদিকে জমা হইয়া রহিয়াছে। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম উত্তরের ঘরের পঁইটা ধসিয়া পড়িয়াছে, জল পড়িয়া দাওয়ায় জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্ত্ত ও নালা হইয়াছে, দেওয়ালের গায় বর্ষার ধারা গড়াইয়া গভীর, অগভীর অসংখ্য দাগ আঁকিয়া দিয়াছে, চালের ভিতর পিঠে ছাউনির খড় দলা হইয়া ঝুলিতেছে, দরজায় মরিচা পড়া একটা তালা লাগান। এই ঘরের পাশেই রান্না ঘর ছিল, এখন সেখানে একটা মাটীর স্তূপ, চারি পাশে দেওয়ালের মাটীগুলা কতক কতক ধসিয়া গিয়াছে, ভিতরের কঞ্চির বেড়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল—মা কই? এসব কি হাল হইয়াছে?" কম্পিত পদে পশ্চিমের

ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম—ঐ ত এ ঘরের দরজা ভেজানই রহিয়াছে! গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল, অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম—মা!

জনহীন জীর্ণ পুরীর বুকে স্বর মিলাইয়া গেল, কোনও সাড়া পাইলাম না।

সাহসে ভর করিয়া দাওয়ায় উঠিলাম, দরজার ফাঁক্ দিয়া ভিতরের অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখিতে পাইলাম মেঝের উপরে সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়া কে পড়িয়া আছে। এঁ্যা! তবে কি মা ঘরের মধ্যেই—

আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম, দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবারও শক্তি রহিল না। চাহিয়া চাহিয়া চোখে পড়িল, একখানি ছেঁড়া মাদুর, তাহার উপর ওয়াড়হীন তেলচিটা একটি বালিশ মাথায়, ছাল উঠা একখানি ময়লা কাঁথা মুড়ি দিয়া কে শুইয়া আছে,—মা কি আমার? শিয়রের কাছে একটা ছোট মাটীর কলসী, মুখে ঢাকা নাই, পাশে একটা পিতলের ঘটী, অপর পাশে থালা ঢাকা একটি পাথর বাটী, থালার উপর একখানি লেবুর খোসা ও কতকটা লবণ। বালিসের কাছে একটা নারিকেল মালা, কয়দিনের সঞ্চিত সর্দ্দি গয়ারে সেটি পূর্ণ। দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলাম।

—হরি ঠাকুরপো! খবর এল?

—মা, ওমা! আমি—

মুহূর্ত্তে মুখের কাঁথা সরিয়া গেল, মা বলিলেন—নরু? বাবা, সুরো এসেছে? খুকীরা—

ধপাস্ করিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলাম।—আজই খবর পেয়েছি, দাদা ত আস্‌তে পার্ব্বেন না আজ, আস্‌বেন তিনি।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।—ভাল আছে ত তারা সবাই?

—হাঁ সবাই ভাল আছেন। আগে খবর দাওনি কেন মা?

—হঠাৎ এতটা বাড়াবাড়ি হবে, তা কি জান্‌তুম? একটু একটু জ্বর হচ্ছিল, ওরকম ত হয়ই, উঠ্‌ছিলুম, খাচ্ছিলুম, তার আর খবর দেব কি? মিছে তোদের ব্যস্ত করা।

আঃ! আজ পাঁচ দিন একেবারে পাড়ি ক'রে ফেলেছে! সেই যে বুধবার রাত্রে জ্বর এল, উঃ বুকে পিঠে সে কি দারুণ ব্যথা, নিশ্বাস ফেল্‌তে কষ্ট, কথা কল্‌তে পারিনে।

আমার ঠাণ্ডা হাতখানি টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিলেন। একটু জিরাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—বিষ্যুদবার সমস্ত দিনের ভেতর আর উঠ্‌তে পার্‌লুম না। সন্ধ্যেবেলা সরির মা খোঁজ নিতে এসে অবস্থা দেখে গেল। পরদিন সকালে জ্বরটা যেন একটু ঝিমু পড়ল', হরি ঠাকুরপো এসে তোদের চিঠি লিখ্‌তে চাইলে, বারণ কর্‌লুম,—আজ যদি জ্বরটা ছেড়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা আবার ধুড়্‌মুড়িয়ে জ্বর। শনিবারে বুঝি চিঠি দিয়েছে। আজ কি বার?

—সোমবার, কথা বল্‌তে কষ্ট হচ্ছে, এখন ওসব কথা থাক্‌।

পেরেকের গায় একখানা ভাঙ্গা পাখা ছিল, পাড়িয়া আনিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। এক সঙ্গে এত কথা বলিয়া মা হাঁপাইতে লাগিলেন। গায়ে তখনও বেশ উত্তাপ রহিয়াছে, বোধ হয় একশ' তিন সাড়ে তিন ডিগ্রী হইবে।

কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া মা বলিলেন—তুই ওঠ্‌ নরু,

কাপড় জামা খুলে মুখ হাত ধুয়ে আয়, ওবাড়ীর কাকীকে খবর দিয়ে আয় তুই এসেছিস্।

—আমার খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না, সে যা হয় হবে'খন। অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে, তোমায় একা রেখে—

—একা!

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া মা বলিলেন—একা! ক'দিন নড়্‌বার শক্তি নেই যে এক ঘটী জল গড়িয়ে নেব। মুখে জল দেবার কেউত কাছে ছিল না। একা বৈকি! আজ চার বছর যে কি ক'রে দিন কাট্‌ছে—শুধু তোদের অমঙ্গল হবে, ভিটেয় সন্ধ্যে পড়্‌বে না, না খেয়ে মাটী কামড়েই পড়ে ছিলুম। আজ তুই বল্‌ছিস্ একা রেখে কি করে যাবি? সুরো যে দিন বৌ'মাদের নিয়ে—নাঃ, তুই ওঠ্ যা মুখ হাত ধো গিয়ে।

অন্ধকার হইয়া আসিল, বলিলাম—ঘরে আলো টালোর—

—দেখ্ দেখি ঐ চৌকির ওপর পীদিম দেশ্‌লাই আছে নাকি। পেয়েছিস্? তেল টেল আছে কি, কি জানি, তিন দিন ত বাড়ীতে সন্ধ্যেই পড়েনি। চৌকির নীচে বার্লির কৌটোয় তেল আছে বোধ হয়।

সব যোগাড় করিয়া লইয়া প্রদীপ জ্বালিলাম। মা বলিলেন—আজ একবার তুলসী তলায় আলোটা দেখিয়ে আয়। আর অম্নি পাঁচীলের বাইরে গিয়ে সরির মাকে খবর দিয়ে আয়।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম—ছোট্ কাকীকে আমার চাল নিতে ব'লে এসেছি। এতক্ষণে মা যেন আশ্বস্ত হইলেন।

আড়ার গায় ক'খানি লেপ ঝুলিতেছিল। তক্তপোষের উপর

উঠিয়া দু' খানি লেপ পাড়িলাম, একেই ত জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা তাহাতে আবার ইঁদুরেরাও জায়গায় জায়গায় কাটিয়া দলা পাকাইয়া অনেকদিন যাবৎ বাস করিতেছিল, নাড়া পাইয়া তাহারা চারিদিকে লাফাইয়া পলাইয়া গেল। তক্তপোষের উপর হইতে হাঁড়ি কুঁড়িগুলা এক পাশ করিয়া, ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া একখানি লেপ পাতিলাম, অপরখানি গায়ে দিবার জন্য পায়ের দিকে রাখিলাম। আর একটি বালিশ জোগাড় করিলাম, নিজের গায়ের উড়ানিখানি দিয়া বালিশ ও পাতা লেপের যতখানি সম্ভব ঢাকিয়া মুড়িয়া দিলাম। তাহার পর তাঁহার যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও মা'কে কোলে করিয়া তুলিয়া খাটের উপর শোয়াইয়া দিলাম। মেঝের মাদুর কাঁথা বাহিরে লইয়া গিয়া বারাণ্ডায় একটা দড়ির উপর টাঙ্গাইয়া দিলাম, থুতুভরা মালাটা পাঁচীল ডিঙ্গাইয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে একখানি সরা খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিছানার পাশে রাখিলাম। সাগুর বাটী ও জলের ঘটী ধুইয়া পরিষ্কার করিলাম।

এসব কাজ রাখিয়া মুখ হাত ধুইবার জন্য এতক্ষণ বরাবরই মা জিদাজিদি করিতেছিলেন। প্রদীপটি ভাল করিয়া উস্কাইয়া দিয়া বলিলাম—আচ্ছা এবার যাচ্ছি।

দরজাটি ভাল করিয়া ভেজাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলাম। প্রথমেই ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ী গেলাম, শুনিলাম একটু পূর্ব্বে তিনি দেড় ক্রোশ দূরে একটি রোগী দেখিতে গিয়াছেন, রাত্রে ফিরিবেন কিনা ঠিক নাই। গ্রামে আর ডাক্তার নাই, আশ পাশের গ্রামে নূতন কেহ আসিয়াছেন কিনা জানি না। ডাক্তার ত পাইলাম না, সেখান হইতে

বিকাশ ও ব্যথা

ফিরিবার পথে বিশুর দোকানে সাগু ও মিছারী কিনিয়া লইলাম। তাহার পর হরিখুড়োর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। মা'য়ের অসুখের কথা ও চিকিৎসার বিষয় কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া ও ছোট্‌কাকীর হাতে সাগু মিছারী দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মা জাগিয়াই ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—এত দেরী হ'ল যে ?

—হরি খুড়োর সঙ্গে কথা বল্‌তেই দেরী হ'য়ে গেল।

এবার জামা জুতা খুলিয়া রাখিয়া, মা'র পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম।

(৭)

সকাল বেলা ঘোষাল মহাশয় মা'কে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন—জ্বরের ওপর অত্যাচার করেই এমন দাঁড়িয়েছে, বুকে পিঠে সর্দ্দি জমেছে, মাথার যন্ত্রণাও খুব বেশী বল্‌ছেন। ওষুধ এনে খাওয়াও দেখা যাক্। তোমার দাদাকে আস্‌তে লিখ্‌লে ভালই হয়।

ডাক্তার বাবু বিদায় লইলেন। দাদাকে ত খবর দিতেই হইবে, এখানে পৌঁছাইয়া মাত্র চারিটি টাকা সম্বল ছিল, কাল পথ্য কিনিয়া ও আজ ডাক্তারের ফি দিয়া আর আড়াইটি মাত্র টাকা অবশিষ্ট আছে, এখনও ঔষধের দাম দিতে হইবে। মায়ের অবস্থাও ভাল বুঝিতেছি না, ডাক্তারত কোন আশাই দিলেন না।

সব কথা খুলিয়া লিখিয়া দাদাকে আসিবার জন্য পত্র দিলাম। বোস সাহেবকেও পত্র লিখিলাম—মা'য়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া হঠাৎ আমাকে দেশে আসিতে হইয়াছে, অনুমতি লইবার সময় হয় নাই—তিনি যেন ক্ষমা করেন। এখানে মা'য়ের অবস্থা বড়ই খারাপ, অন্য কেহও নাই, সুতরাং সাহেব যেন দয়া করিয়া আমাকে কিছুদিনের জন্য ছুটী দেন।

চিঠি দুইখানি ডাকে দিয়া আসিয়া মা'র কাছে বসিলাম। ফিরিবার সময় ঔষধ তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছিলাম, মাকে ঔষধ পান করাইলাম। রাত্রের অপেক্ষা এখন উত্তাপ একটু কমই ঠেকিতেছিল,

তবে গলার ভিতর একটা শোঁ শোঁ শব্দ শুনা যাইতেছিল। তাহা হইলেও এখন তিনি রাত্রের অপেক্ষা যেন সহজ ভাবেই কথা বলিতেছিলেন।

চার বৎসর পূর্ব্বে দাদা কলিকাতায় পরিবার লইয়া যান, তাহার পর আর তিনি বাড়ী আসেন নাই, আমিও অনেক দিন আসিতে পারি নাই। বৎসর দেড়েক পূর্ব্বে একবার চন্দ্র গ্রহণ উপলক্ষে প্রতিবেশীদের সহিত মা কলিকাতায় গিয়াছিলেন, সপ্তাহ: খানেক থাকিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলাম প্রথম প্রথম দাদা মাসে পাঁচ টাকা করিয়া মাকে খরচ দিতেন, কিছুদিন হইতে নিজের পরিবার বৃদ্ধির দোহাই দিয়া এখন এক টাকা কম করিয়াই পাঠান। আজ কালকার বাজারে মাসে চারটি টাকায় একটা বিধবারও পেট চলে না। বাগানের কলাটা বেলটা বিক্রয় করিয়া, নিজহাতে লাউ কুমড়া গাছ পুতিয়া কোনও রকমে মায়ের দিন চলিতেছিল। চালে খড় ছিল না, রান্না ঘরখানি বিনা মেরামতে পড়িয়া যাইতেছিল, অনেক করিয়া লিখিয়া লিখিয়াও দাদার নিকট হইতে তিনি একটি পয়সাও পা'ন নাই। তিনি আর কি করিবেন? রান্না ঘরখানি পড়িয়া গিয়াছে, উত্তরের ঘরখানিও এই বর্ষায় শেষ হইবে। অল্প বয়সে দুইটি শিশু লইয়া মা বিধবা হইয়াছিলেন, হাতের সম্বল, গায়ের গহনা-গাঁটি কয়খানাও খুয়াইয়া বড় ছেলেটিকে মানুষ করিয়াছিলেন। সুরো বড় হইল, ভাল চাকরী পাইল। বড় আশা করিয়া মা পুত্রবধু ঘরে আনিলেন,—সুখের সংসার পাতিবেন। ভগবানের কৃপায় সুরোর দিন দিন উন্নতিই হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন, নিজের কষ্ট হইতেছে, মেয়েটিরও এ পাড়াগাঁয় ম্যালেরিয়া

সারিতেছে না বলিয়া সুরো স্ত্রী-কন্যা লইয়া গিয়া কলিকাতা বাসা করিল। বাড়ী আগলাইতে মা দেশেই রহিলেন।

এ সব কথা সমস্তই ত জানিতাম, তবুও আজ পীড়িতা মায়ের মুখে কথা গুলি শুনিয়া প্রাণে বড় আঘাত পাইলাম—দাদার উপর কেমন অশ্রদ্ধা আসিল। কিন্তু আমার নিজেরও ত এই কুড়ি বৎসর বয়স হইতে চলিল, আমিই বা মায়ের কি সাহায্য করিয়াছি, কয়দিন কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছি ?

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও বাড়িতে লাগিল, যন্ত্রণাও বোধ হয় খুব বেশীই হইতেছিল। মুখে মা কোন কথা না বলিলেও আরক্ত চক্ষু, ঘন ঘন নিশ্বাস ও গলার ঘড় ঘড় শব্দে বুঝিতেছিলাম, সামান্য কষ্ট হইতেছে না। বেলা দেড়টার সময় আজ হরিখুড়ো আসিয়া কাছে বসিলেন, তখন আমি স্নান আহার করিতে উঠিয়া গেলাম।

বৈকালে রৌদ্র পড়িয়া আসিতে মা একটু স্থির হইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম উত্তাপ অনেক কম পড়িয়াছে, মনে করিলাম তিন দাগ ঔষধ পেটে পড়িতে জ্বর কমিয়াছে, আর বোধ হয় বাড়িবে না।

শেষ রাত্রের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ সজাগ হইয়া শুনিতে পাইলাম মা কি বলিতেছেন। উঠিয়া বসিলাম, শুনিলাম তিনি বলিতেছেন—তুমি একবার বুঝিয়ে বল বৌ'মা, একা আমি কেমন ক'রে এখানে থাকি ? * * * কে সুরো, শুনবি নি কথা ? বাবা আমি যে তোর মা, তোর বৌ' মেয়ে কি আমার পর ? * * * সবাই

চলে' গেল, কেউ মুখ চাইলে না! * * * উঃ মাথা ফে'টে গেল! সুরো এলি বাবা?

আরও কত কি বলিতে লাগিলেন, বিরাম নাই, বুঝিলাম জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছেন। চোখ দুইটি ভীষণ লাল হইয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টি কেমন লক্ষ্যহীন, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ছুড়িতেছেন। বড় ভয় হইল, একা এই রাত্রে কি করিব, কাহাকে ডাকিব? ঘটী করিয়া জল আনিয়া, ভিজা হাতে তাঁহার চোখ মুখ মুছিয়া দিলাম, কপালে জলপটী বসাইয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। এক একবার তিনি কেমন করিয়া আমার দিকে চাহিতেছিলেন, আমাকে আর চিনিতে পারিতেছেন বলিয়া বোধ হইল না। ঘণ্টা খানেক ধরিয়া জলপটী ভিজাইয়া দিয়া বাতাস করিতে করিতে তাঁহার বকুনী একটু কম পড়িল, যন্ত্রণারও বোধ হয় কিছু উপশম হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

চালের ফাঁক দিয়া ভোরের আলো দেখা দিল। নিঃশব্দে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। পাঁচীলের দ্বার খুলিয়া হরিখুড়োকে ডাকিয়া আনিলাম। মা'র কাছে তাঁহাকে একটু বসিতে অনুরোধ করিয়া ডাক্তার বাড়ী ছুটিলাম। ডাকাডাকি করিতে ঘোষাল মহাশয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—খবর কি?

মায়ের জ্বর বৃদ্ধি ও প্রলাপ বকার কথা বলিলাম।

গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন—তুমি যেতে লাগ, মুখ হাত ধু'য়ে আমি এখনই আস্‌ছি। ব্যস্ত হবার কিছু নেই, ব্যস্ত হ'য়ে কি কর্‌বে, এ রোগে ডাক্তারেরও কোন সাধ্য নেই। যা সন্দেহ করেছিলুম,

দেখ্‌ছি নিউমোনিয়া থেকে টাইফয়েডে দাঁড়িয়েছে। কাল রাত্রে তা' হ'লে খুবই ডিলিরিয়ম্ দেখা দিয়েছে? আচ্ছা যাও তুমি, আমি এই এলুম ব'লে।

মা'য়ের টাইফয়েড্ হইয়াছে! চিন্তিত ও বিষণ্ণ-হৃদয়ে বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। শুনিয়াছি অধিক বয়সে এ রোগ হইলে আর জীবনের আশা থাকে না। তবে কি মা আমার বাঁচিবেন না?

ডাক্তার আসিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ফি'র টাকা লইয়া মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

হাতে আর টাকা পয়সা কিছুই নাই, এই মাত্র ডাক্তার বাবু শেষ টাকাটিও লইয়া গেলেন। অন্য উপায় না দেখিয়া হরি-খুড়োর কাছে গোটা কয়েক টাকা ধার চাহিলাম—আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে দাদা নিশ্চয়ই আসিয়া পৌছাবেন, না—ই যদি আসেন কাল সকালের ডাকে টাকা আসিবেই তখন দেনা শোধ করিব।

অবাক্ হইয়া হরিখুড়ো কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—টাকা? আমি টাকা ধার দেব'! চাক্‌রী বাক্‌রী করিনে, নগদ টাকা কোথায় পাব' আমি? খেত খামার থেকে কোনও গতিকে পেট চলে মাত্র। থাক্‌লে কি আর বৌ'ঠানের অসুখ, আমি—

থাক্, জানিতাম তেজারতিতে তাঁহার দশ বার হাজার টাকা খাটিয়া থাকে। কিন্তু না দিলে জোর কি? আশা করিলাম, আজ সকালে দাদা আমার পত্র পাইয়াছেন, বিকালে নিশ্চয়ই তিনি আসিয়া পৌছাইবেন, না আসেন টাকাত কাল আসিবেই।

বিকাশ ও ব্যথা

রোগীর অবস্থা সমস্ত দিন একভাবেই রহিল। আজ আর মুখে কিছুই লইতেছেন না, কিছু দিলে থুথু করিয়া ফেলিয়া দিতেছেন। আর দিবার জিনিষই বা কি ছিল, হয় একটু সাগু না হয় দু' ঝিনুক দুধ। সংজ্ঞা আছে বলিয়া বোধ হইতেছিল না, সমস্ত দিন অস্থির ভাবে এ পাশ ওপাশ আর সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকা।

বৈকাল হইল, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দাদা আসিলেন না। এরূপ বিপন্ন রোগী লইয়া আজ আর একা থাকিতে সাহস হইবে না। দিনের বেলা পাড়ার দুই একজন আসিয়া খবর লইয়া গিয়াছিলেন। রাত্রি নয়টার সময় হরি খুড়ো আসিয়া আপনা হইতেই আজ এখানে রাত্রি যাপন করিতে চাহিলেন। ক্ষুধা থাকিলেও খাইবার ইচ্ছা হইল না, বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলাম।

সমস্ত রাত্রের মধ্যে মা একবারও চোখ বুজিলেন না। জলপটী দিয়া মাথায় বাতাস করিয়াও আজ আর কোন ফলই হইল না।

সকাল হইল। আজ ডাক্তারের ফি দিবার টাকা নাই। কি করিব? দশটার গাড়ী আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় কি? সমস্ত রাত যুঝিয়া এখন মা কেমন নিস্তেজ হইয়া চুপ করিয়াছিলেন।

হরি খুড়ো মুখ হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে দশটা বাজিল। ক্রমে দশটার গাড়ীর যাত্রীদের গ্রামে পৌছাইবার সময় হইল। অস্থির চিত্তে পাঁচীলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কতক্ষণ পরে দেখিলাম, লক্ষ্মণ দাস ডাক কাঁধে ষ্টেশনের দিক হইতে আসিতেছে। কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম— লক্ষ্মদা, দাদা এসেছেন দেখলে?

—কই দেখিনি ত বাবু। এ গাড়ীতে গ্রামের কা'কেও ত নাম্‌তে দেখলুম না।

সত্যই কি তবে দাদা আসিলেন না—মায়ের এ আসন্ন অবস্থা জানিয়াও তিনি আসিলেন না? এখন আমি কি করিব?

মাতালের মত টলিতে টলিতে ভিতরে ঢুকিলাম। দাওয়া হইতে খুড়ো জিজ্ঞাসা করিলেন—সুরো এসেছে দেখ্‌লি?

—না, তিনি আস্‌বেন না। কি কর্‌বো হরিখুড়ো?

—তাইত, বড় বিপদের কথা ত! তা তুই একবার ডাক ঘরে দেখে আয় দিকি, সুরো নিশ্চয় টাকা পাঠিয়েছে, খবর দিয়েছে। আমি না হয় ততক্ষণ বৌ'ঠানের কাছে বস্‌ছি।

যন্ত্র চালিতের ন্যায় তখনই ডাক ঘরের দিকে ছুটিলাম। ঘরের মধ্যে পৌঁছাইতে লক্ষ্মণ দাস বলিল—এই যে ছোট বাবু নিজেই এসেছেন, আমি মনে কর্চ্ছিলুম, আগেই আপনার মণিঅর্ডারটা আর চিঠি দু'খানা দিয়ে তবে অন্য জায়গায় যাব'।

দেরী সহিতেছিল না, অস্থির ভাবে বলিলাম—দাও লক্ষ্মণদা, শীগ্‌গির দাও।

মাষ্টার মহাশয় বিদেশী লোক, তিনি বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ বলিল—আহা ওনার মা'য়ের বড় ব্যামো, দিন্ মাষ্টার মশায় নরেন্দ্রনাথ ঘোষের মনিঅর্ডারটা আগে বা'র করে দিন্।

ব্যাগের ভিতর হইতে দুখানি খাম বাহির করিয়া লক্ষ্মণ আমার হাতে দিল, একখানিতে দাদার হাতের লেখা, অন্য খানি বোধ হয় বোস সাহেবেরই লিখিত হইবে। মাষ্টার মহাশয় তখনও বই খুলিয়া

মনিঅর্ডার এন্‌টার করিতেছেন। তাড়াতাড়ি দাদার পত্রখানি খুলিলাম। প্রথমবার পড়িয়া কিছুই বুঝিলাম না, আবার পড়িলাম তিনি লিখিতেছেন—মা'র অসুখ বাড়িয়াছে শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। যত সত্বর সম্ভব ২।১ দিনের মধ্যে আমি যাইবার চেষ্টায় রহিলাম। তোমার বৌদিদের লইয়া যাইবার জন্য কালি নগরে খবর দিতেছি, আর ছুটীর জন্য আজই সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিব। পত্রপাঠ সংবাদ দিবে।

কই টাকা কড়ির কথা ত তিনি কিছুই লিখেন নাই। তা না লিখুন টাকা আসিয়াছে,—চট্‌ করে দিন্ না মশায়।" মাষ্টার মহাশয়ের হাত হইতে ফারম্ খানি একরকম কাড়িয়াই লইলাম। দেখিলাম বোস সাহেব আমাকে পঁচিশ টাকা পাঠাইয়াছেন। মাষ্টার মহাশয় একটি একটি করিয়া টেবিলের উপর টাকা গণিয়া রাখিতেছিলেন। সহি করিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি টাকাগুলি তুলিয়া লইয়া চঞ্চল পদে বাহিরে আসিলাম। দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম—

প্রিয় নরেন্!

আজ এই মাত্র তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার মা ঠাকুরাণীর পীড়া সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হইলাম। তোমার মা'য়ের কঠিন পীড়া, তুমি তাঁহার কাছে গিয়াছ, তাহাতে আমার কি আপত্তি থাকিতে পারে? আমার অনুমতি লইবার জন্য অকারণ দেরী কর নাই, ভালই করিয়াছ। ইহাতে তোমার কুণ্ঠিত হইবার কিছুই নাই, ক্ষমা চাহিয়া আমাকে মিথ্যা কেন লজ্জিত কর?

তোমার মা ঠাকুরাণীর চিকিৎসার যেন কোনও ত্রুটী না হয়, ওখানে ভাল ডাক্তার না থাকে আমাকে "তার" করিবে এখান হইতে

ডাক্তার পাঠাইব। চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য পঁচিশটি টাকা পাঠাইলাম, লইতে দ্বিধা করিও না, জান'ত তোমাকে আমি পুত্রের মতই দেখি। বৌঠানের অবস্থা কেমন থাকে আমাকে পত্রপাঠ জানাইবে। শরীর ভাল থাকিলে আমি নিজেই যাইতাম।

নিজের শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, বিপদে মূহ্যমান হইও না, বিপদ তাহা হইলে আরও বাড়িয়া যাইবে। সম্ভব হইলে ফেরৎ ডাকে আমাকে সমস্ত খবর জানাইবে। আজ দু'দিন আমার পায়ের ব্যথা একটু কমই আছে। নীলিমা ভালই আছে, তোমাকে আলাদা পত্র দিতেছে।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে, বৌ'ঠান্‌কে প্রণাম দিবে। ভগবানের নিকট তাঁহার আরোগ্য কামনা করি। ইতি—

তোমার নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
চার্লস অজিত মোহন বসু।

মিস্ বোস লিখিয়াছেন—

My dear Naren

মা'র অসুখ শু'নে বড়ই উদ্বিগ্ন রইলুম। শীঘ্র খবর দিও তিনি কেমন আছেন। বাবাকে জানাতে লজ্জা হয়, তোমার ব'নকে জানিয়ো —টাকার দরকার হলেই 'তার' করো। নইলে আমি বড়ই দুঃখিত হব, খুব রাগ করবো তোমার ওপর। মাকে আমার প্রণাম দিও।

তোমার স্নেহের
মিস্ বোস্

চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল, পত্র দুখানি মুড়িয়া আবার খামে পুরিলাম, পকেটে রাখিতে গিয় দাদার পত্র হাতে ঠেকিল। টানিয়া সেখানি বাহির করিলাম, অন্যমনস্কে দলা করিয়া দলাটি পথের ধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই কি মনে হইল, ফিরিয়া গিয়া আবার সেটি কুড়াইয়া লইলাম, পকেটে এক সঙ্গে তিনখানি পত্রই রাখিয়া দিলাম।

পথে, ঘোষাল মহাশয়কে এখনই আসিবার জন্য বলিয়া আসিলাম। কিছু ডালিম বেদানা আনিবার জন্য ষ্টেসনের বাজারে একটি লোক পাঠাইলাম। টাকা পাইয়া ও বোস সাহেবের পত্র পড়িয়া, এত বড় বিপদের মধ্যে আজ যেন প্রাণে নূতন বল আসিল।

ভিজিটের টাকাটি হাতে লইয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—আমি ত ভাল বুঝছি না, চাঁদগাঁর ভবেন বাবুকে দেখাতে চাও, এখনি সেখানে লোক পাঠাও, তোমার দাদা আসেন নি? ইচ্ছা কর তাঁকে টেলিগ্রাম কর্ত্তে পার।

বাহিরে গিয়া হরিখুড়োর সহিত নিভৃতে তিনি আরও কি বলিয়া গেলেন।

দেখিয়া শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর আবার যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। তাহা হইলে সত্য সত্যই মা আমাদের ছাড়িয়া চলিলেন?

বেলা একটা বাজে, মাথায় এখনও জল পড়ে নাই, গত রাত্রি হইতে পেটে ভাত নাই, দু'রাত্রি চোখ বুজিতে পারি নাই, শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তবুও জোর করিয়াই আপনাকে খাড়া রাখিতে হইল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিতাই বৈরাগীর আখড়ায় গেলাম, সে খাইতে বসিয়াছিল, আহার শেষ হইলে তাহাকে আমাদের বাড়ী যাইতে বলিয়া দক্ষিণ পাড়ার যদু দত্তের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। এই বাড়ীতে মায়ের দূরসম্পর্কিয়া এক ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল।—পদ্মমাসি বরাবরই মধ্যে মধ্যে আমাদের খোঁজ খবর লইতেন, মা'য়ের অসুখ বাড়াবাড়ি শুনিয়া তিনি তখনই আমার সহিত আসিলেন।

নিতাই বৈরাগী দাওয়ায় অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিয়া বলিলাম—নিতাই কাকা মা'র অবস্থা বড়ই খারাপ, চাঁদগাঁয়ের ভবেন ডাক্তারকে একবার ডেকে আন্‌তে হবে তোমায়।

টেলিগ্রামের ফারম্ কোথায় খুঁজিব—একখানা কাগজে দাদাকে টেলিগ্রাম করিবার জন্য লিখিয়া দিলাম—

মার আসন্ন অবস্থা, তোমায় একবার দেখিতে চাহেন।

একখানি দশ টাকার নোট নিতাইয়ের হাতে দিয়া বলিয়া দিলাম—ডাক্তারকে সন্ধ্যের মধ্যে আনতেই চাও, যত টাকা লাগে। আর বড় ডাকঘরে এই টেলিগ্রামটা লিখিয়ে পাঠিয়ে দিও।

নিতাই বৈরাগী আমাদের জমিতে আখ্‌ড়া গাড়িয়া বিনা খাজানায় বাস করিত। দ্বিরুক্তি না করিয়া সে চাঁদগাঁয় ডাক্তার আনিতে ছুটিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া এতক্ষণ পরে মার শয্যা পার্শ্বে ফিরিয়া গেলাম।

মাসিমা জিদাজিদি করিতে লাগিলেন, হরিখুড়োও টানাটানি করিতেছিলেন, অগত্যা সাড়ে তিনটার সময় স্নান করিয়া নাম মাত্র দু'টি ভাত মুখে দিলাম।

বিকাশ ও ব্যথা

আমাদের গ্রাম হইতে চাঁদগাঁ প্রায় তিন ক্রোশ পথ। নিতাই বেলা দুইটার সময় রওনা হইয়াছে, ডাক্তার লইয়া সে সাতটা সাড়ে সাতটার পূর্ব্বে ফিরিতে পারিবে না।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্ব হইতেই মার ঘাম হইতে লাগিল, বালিশ বিছানা সব ভিজিয়া উঠিল। প্রলাপ বকা তখন থামিয়া গিয়াছে। মনে করিলাম এবার বুঝি জ্বর বিয়োগ হইতেছে। হরিখুড়ো দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, মাসি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে কি বলিয়া আসিলেন। খুড়ো ঘরে আসিয়া মায়ের হাতে ও পায় হাত দিয়া দেখিলেন, আলোটি একবার উঁচু করিয়া কতক্ষণ মার মুখের উপর চাহিয়া রহিলেন। আমাকে বলিলেন—ডাক্তারের আস্‌তে এখনও দেরী আছে, তুমি ততক্ষণ ওবাড়ী থেকে খাওয়াটা সেরে এস।

তাঁহার স্বরটা কেমন গাঢ় বলিয়া বোধ হইল। কারণ আমিও বুঝিতেছিলাম, তাই মাকে ছাড়িয়া এখন আর উঠিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলাম না।

কতক্ষণ হইতে মা'র কোন সাড়া শব্দই ছিল না, ঘামিয়া ঘামিয়া তিনি একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে এক একবার হাঁ করিতেছিলেন ও কেমন একরকম চাহনিতে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। শিয়রে বসিয়া মাসি মধ্যে মধ্যে আঙ্গুলে করিয়া জল লইয়া নীরবে মার ঠোঁট দুখানি ভিজাইয়া দিতেছিলেন।

সেদিন কি তিথি ছিল মনে নাই, সন্ধ্যার পরেই ঘোর অন্ধকার হইয়া আসিল, মেঘও জমিয়াছিল বোধ হয়, মনে আছে চারিদিকে কেমন গুমট করিয়া ছিল, একটুও বাতাস ছিল না। বাহিরে গভীর অন্ধকার, প্রকৃতি

নীরব, ভিতরে অনন্ত অন্ধকারের পথযাত্রী, তাহাকে ঘিরিয়া নির্ব্বাক উৎকণ্ঠায় আর কয়টি প্রাণী যেন কিসের অপেক্ষা করিয়াই বসিয়া আছে! স্তিমিত আলোকে আর একটি তৈলহীন দীপ পলে পলে ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়া নিভিয়া আসিতেছে!

আলোতে বোধ হয় জলের ছিটা বা অপর কিছু পড়িয়াছিল, ফট্‌ফট্‌ শব্দ করিয়া দীপ-শিখা নাচিয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। কলিকার আগুন বোধ হয় নিভিয়াই গিয়াছিল, একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া হরিখুড়ো চুপ করিয়া দাওয়ায় বসিয়াছিলেন। দরজার ফাঁক দিয়া একটা আলোর রেখা বাহিরে আসিয়া অন্ধকারের বুক চিরিয়া উঠানে পড়িল।

কে যেন বাহিরে ডাকিল না? নিতাই বুঝি বড় ডাক্তার লইয়া ফিরিল। নীচে নামিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের দরজা খুলিয়া দিলাম, নিতাই বটে, কিন্তু সে একা ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু বাড়ী নেই, রায়পাড়ায় জমিদার বাড়ী গেছেন, আজ আর ফিরবেন না তিনি। ঠাকরুণ্ কি এখনও সেই রকম—

কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিয়া মাসি একটা ল্যাম্প জ্বালিয়া বাহিরে রাখিলেন। আমার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতে নিতাইয়ের বুঝি কেমন দয়া হইল, তাই ক্ষুণ্ণস্বরে আবার বলিল—কি করবো ছোটবাবু, বেলা চারটের আগেই ত চাঁদগায় পৌঁছেছিলুম, কিন্তু অদেষ্ট মন্দ! বলেন ত ঘোষাল মশাইকে না হয় আর একবার ডেকে আনি।

হরিখুড়ো বলিলেন—হ্যাঁ তাই যা, আর ফিরবার মুখে অমনি—বুঝ্‌লি নিতাই—

কাছে সরিয়া গিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া আরও কি বলিয়া দিলেন।

বিকাশ ও ব্যথা

চোখের সম্মুখে কাহারও মৃত্যু দেখি নাই। মৃত্যু-যন্ত্রণা যে এত ভীষণ তাহা জানিতাম না। রাত্রি এগারটার সময় মার জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল, গলার মধ্যে ঘড়র ঘড়র শব্দ হইতেছিল, মুখ দিয়া এবার গাঁজ্‌লা উঠিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই হাত-পা ঠাণ্ডা হিম্‌ হইয়া আসিয়াছিল। এক একবার চোখ চাহিতেছিলেন, মনে হইতেছিল চোখগুলি বুঝি ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। বালিসের উপর মাথাটা এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ক্ষীণ প্রাণটাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এ কি সংগ্রাম!—ইহারই নাম মৃত্যু? বসিয়া থাকিয়া চোখে আর এ যন্ত্রণা দেখিতে পারিতেছিলাম না, মনে হইতে লাগিল, এখনই এ সংগ্রামের অবসান হউক, মার যন্ত্রণা শেষ হউক, আর যে দেখিতে পারি না—

ঘোষাল মহাশয় আসেন নাই, বলিয়া দিয়াছিলেন—যাইয়া আর কি করিব, কেমন থাকেন সকালে খবর দিও, দরকার হয় যাইব।

নিতাই কয়েক মিনিটের জন্য বাড়ী হইতে ঘুরিয়া আসিল। দুই তিন জন প্রতিবেশীও কিছুক্ষণ হইল আসিয়াছেন, বাহিরে গোটা দুই হারিকেন জ্বলিতেছে, যেন উৎসব বাড়ী!

কেহ ঘরের ভিতর শয্যাপার্শ্বে, কেহ বাহিরে বারাণ্ডায় অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিসের অপেক্ষা! মৃত্যুর জন্যই বোধ হয়! কাহার মনে তখন কি হইতেছিল বুঝিতেছিলাম না।

বাহিরের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। দূরে গ্রাম প্রান্তে একটা কুকুর চিৎকার করিয়া প্রতিবাদ জানাইল।

হঠাৎ আবার চোখ চাহিয়া মা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

এবার দৃষ্টি যেন সজ্ঞানের দৃষ্টি, কাহাকে যেন খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, পাছ-তলার কাছে আমার উপর আসিয়া দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল, একবার ঠোঁট দুটি একটু নড়িয়া উঠিল। সরিয়া আসিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম—মা ওমা, আমি যে তোমার নরু মা—বড় কষ্ট হচ্ছে কি মা?

দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিল ঠোঁট দুখানি আরও একটু নড়িল। তাহার পর আমার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি সরিয়া গিয়া চারিদিকে আবার যেন কাহার সন্ধানে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চোখের দুই কোণ বাহিয়া জল গড়াইল। হায় মাতৃ হৃদয়ের অন্ধ স্নেহ! শেষ মুহূর্ত্তে এই যন্ত্রণার মাঝেও কাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছ!

ঘড়াৎ করিরা বুকের ভিতর হইতে একটা শব্দ বাহির হইল, আবার পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল, চোখ কপালে উঠিল। ঘরের মধ্যে কে বলিয়া উঠিল—আর কি দেখ্‌ছ সবাই, শেষটা কি ঘরের মধ্যেই—

সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি ধরাধরি করিয়া মাকে আমার বাহিরে আনিয়া উঠানের মাঝখানে শোয়াইয়া দিল—হরে রাম রাম রাম হরে হরে—

ঘণ্টা খানেক বোধ হয় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া ছিলাম। চোখ চাহিয়া দেখিলাম কে আমার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেছে। হরিখুড়ো কাছে আসিয়া বলিলেন—উঠে বস বাবা নরু, বেটা ছেলে যে তুমি, তুমি অমন অধীর হ'লে চল্‌বে কেন? নিজে হাতেই এখন যে তোমায় সবই কর্ত্তে হবে বাবা।

বিকাশ ও ব্যথা

হাঁ নিজ হাতেই মায়ের সব কাজ আমাকে করিতে হইবে! জীবন্তে তাঁহার কোন কাজই করিতে পারি নাই, আজ যে তাহার শোধ দিতে হইবে! উঠিয়া বসিলাম। উঠানের এক পাশে মাসিই বোধ হয় বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিলেন, ইচ্ছা হইল, আমিও চিৎকার করিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠি। কিন্তু সব কান্না বুঝি বুকের ভিতর জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, কাঁদিতে পারি কই!

ইছামতী তীরে গ্রামের শ্মশানঘাটে চিতা জলিয়া উঠিল ধূ ধূ। জলিবে না? নিজের হাতেই যে মায়ের মুখে আগুন জালিয়া দিয়াছি! জলুক খুব জলুক চিতা।

বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, মা, আমার মা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলেন। জল ঢাল্‌বো না, চিতা ঠাণ্ডা কর্‌বো না আমি? পুত্র হ'য়ে জন্মেছিলুম, জীবন্তে ত মায়ের বুকের মধ্যের চিতা নিভুতে পারিনি, আজ আর জল ঢেলে সব ছাই ভাসিয়ে দিতে পারবো না? তবে আর তাঁর কিসের পুত্র হয়ে জন্মেছিলুম?

ভোর না হইতেই সব শেষ হইয়া গেল। সকলে হরিধ্বনি করিয়া গ্রামের দিকে ফিরিল। গ্রামে আর যাইব না, কে আছে, কি আছে সেখানে আর? অর্দ্ধেক পথ আসিয়া ষ্টেশনের রাস্তা ধরিলাম। সকলে বারণ করিল, বাধা দিল, কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

(৮)

—কে ও? মেঝের ওপর অমন ক'রে ব'সে ও কে—নরেন—একি!

ধপাস্ করিয়া বইগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া মিস বোস্, কার্পেটের উপর আমার পাশে বসিয়া পড়িলেন, বুঝিতে তাঁহার দেরী হইল না, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—কবে?

—রাত একটার সময়।

সরিয়া আসিয়া পিঠের উপর হাত রাখিলেন, মুখ তুলিয়া দেখিলাম চোখ দু'টি তাঁর সজল হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত মুখখানিতে একটা ব্যথা জাগিতেছে। চাহিয়া চাহিয়া এবার এতক্ষণ পরে আমার শুষ্ক চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। নিজের বসন প্রান্তে অশ্রু মুছাইয়া মিস্ বোস আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—কি ব'লে তোমায় সান্ত্বনা দেব, অমন ক'রো না নরেন, আমার প্রাণের ভেতর যে কেমন কর্চ্ছে। পুরুষ মানুষ তুমি—কাঁধের উপর হাত রাখিয়াই নীরবে রহিলেন।

সাহেব খবর পাইয়া তাড়াতাড়ি বেয়ারার হাতে ভর দিয়া বাহিরে আসিলেন,—নরেন্ ওঠ' বাবা অত অধৈর্য্য হ'য়ো না। মৃত্যুর ওপর কারও যে হাত নেই! বুক ভেঙ্গে গেলেও কোন উপায়ই নেই। তাঁর সময় হয়েছিল, চলে গেছেন। পুরুষ মানুষ তুমি অবুঝ নও, শোকে অধৈর্য্য হ'য়ো না বাবা।

বিকাশ ও ব্যথা

মিস্ বোস্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে টানিয়া তুলিলেন, চেয়ারের কাছে লইয়া গিয়া বসিবার জন্য নীরবে হাত টানিয়া ইঙ্গিত করিলেন। কাষ্ঠাসনে বসিতে নাই, দাঁড়াইয়া রহিলাম। লক্ষ্য করিয়া বোস সাহেব কন্যাকে বলিলেন—নরেন ত আজ শুধু চেয়ারে বস্‌বে না মা, একটা রাগ্ এনে পেতে দাও।

মিস্ অন্য ঘরে রাগ্ আনিতে গেলেন। বোস্ সাহেব বলিলেন—কল্‌কাতায় কবে এলে?

—ঘণ্টা খানেক আগে, ন'টার গাড়ীতে এসেছি।

—আজই ন'টার গাড়ীতে এসেছ! তোমার মা ঠাকুরুণ তা হলে—

—কাল রাত একটার সময় মারা গেছেন। আর বাড়ী ফিরিনি ঘাট থেকেই চলে এসেছি, বাসায়ও যায়নি এখনও। আপনার দেওয়া টাকা ক'টায় মা'র শেষ কাজ কর্ত্তে পেরেছি, প্রথমে তাই আপনার কাছেই এসেছি।

মিস কম্বল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সাহেব তাঁহাকে বলিলেন—মালিকে একবার ডাকিয়ে পাঠাও মা, নরেনের মুখ হাত ধোবার জল দিক্। তুমি ততক্ষণ রঘুসিংকে দিয়ে কিছু ফলটল আর এক গ্লাস সরবৎ করিয়ে নাও, আজত নরেন আমাদের ছোঁয়া কিছু ব্যবহার কর্ত্তে পাবে না।

—না না, ওসব জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না আপনাদের, অনেক দয়া আপনার, আপনি টাকা ক'টা না পাঠালে আজ যে আমার মায়ের সৎকার হ'ত না, আপনার এ দয়া যতদিন বাঁচবো ভুল্‌তে পারবো' না।

—সে কি কথা বল্‌ছ' বাবা, তোমাকে ত আমি পর মনে করি না।

ওসব তুমি কি কথা বল্‌ছ' নরেন? ওঠ' চোখে মুখে জল দাও, একটু ঠাণ্ডা হও। হঠাৎ বাসায় গিয়ে সকলকে অসময়ে আঘাত করনি ভালই করেছ'। ওবেলা রোদ পড়্‌লে তোমার দাদার অফিস থেকে ফিরবার সময় হ'লে, বাসায় যাবে'খন, কেমন?

—বাসা! না, আর বাসায় যাব' না। মা নেই—অচিকিৎসায়, চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে মা আজ কেন মারা গেলেন জানেন? —দাদার মুখ আর—না, বাসায় যাবার কথা আমায় বল্‌বেন না, দাদার কাছে আর ফিরে যেতে পারব' না আমি,—প্রবৃত্তি হবে না। মা চলে গেছেন, আজ সব বাঁধনের আমার শেষ হ'য়ে গেছে,—কেউ নেই আর।

—ছিঃ নরেন্! শোকে অধীর হ'য়ে পাগলের মত কি সব বলছ' তুমি? এখন ঠাণ্ডা হও, মাথা ঠিক কর, তার পর ও সব কথা হবে তখন। কইরে মালি, জল আন্‌লি?

মিস্ বোস কলেজে যাইবেন বলিয়া বই লইয়া বাহির হইতেছিলেন, টেবিলের উপর বই পড়িয়া রহিল, গাড়ী আস্তাবলে ফিরিয়া গেল, আজ আর তাঁহার কলেজে যাওয়া হইল না। সদ্য মাতৃহীনকে লইয়া পিতা পুত্রী সমস্তদিন ব্যস্ত রহিলেন।

অনেক করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্বে আমাকে সঙ্গে লইয়া বোস সাহেব ও মিস্ বোস চোর বাগানের বাসায় উপস্থিত হইলেন। দুইটি স্নেহশীল হৃদয়ের সযত্ন চেষ্টায় আমার মনের অবস্থা তখন অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

এরূপ বেশে আমাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াই দাদা

বুঝিতে পারিলেন, চোখ দিয়া বোধ হয় দু'ফোঁটা জলও বাহির হইল। বৌদি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, মিস্ বোস তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন। অমনি কি ভাবিয়া কি জানি, বৌদি চঞ্চলপদে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন ; কান্না ও থামিয়া গেল। দেখিলাম, মিস্ বোস কেমন অপ্রস্তুত ভাবে বাহিরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছেন। বোস সাহেব কতক্ষণ ধরিয়া সময়োচিত প্রবোধ বাক্যে দাদাদাকে বুঝাইয়া অবশেষে কন্যার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়ীতে উঠিয়া মিস্ বোস বলিলেন—কাল কখন আস্ছ নরেন? ব্যস্তভাবে বোস সাহেব বলিলেন—না না, এ অবস্থায় কষ্ট করে ওর যাবার দরকার কি, আমরা না হয় বেড়াতে না গিয়ে, কালও একবার এদিকে আস্‌ব, 'দেখে শুনে যাব।

বোস সাহেব এখনও নিরবলম্বনে পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারেন না, আজ উঠা নামা করিতে তাঁহার কত কষ্ট হইতেছিল! বলিলাম—আমি নিজেই যাব, আপনারা আর কেন মিছে কষ্ট কর্‌বেন্, আজকার এই টানা হিঁচ্ড়ুনিতেই হয়ত আবার আপনার ব্যথা বাড়্‌তে পারে। বাড়ী বসে কি কর্‌ব', পাঁচটার সময় আমিই যাব, আপনারা আর আস্‌বেন না।

—ঠিক ত? নরেনকে বলে দিন্ না বাবা, শরীরের প্রতি অনর্থক যেন আর অত্যাচার না করে, ক'দিনেই কি চেহারা হয়েছে দেখছেন!

মুখে একটু ম্লান হাসি আনিয়া বোস সাহেব বলিলেন—তোমার ভাই তুমি বারণ কর, তোমার চেয়ে কি আর অমার কথা বেশী ক'রে শুন্‌বে? কি বল নরেন?

সলজ্জ ভাবে মুখ নত করিলাম। বোস্ সাহেব বলিলেন—আচ্ছা তুমিই তা'হলে কাল এস।

গাড়ী চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, দাদা রান্না ঘরের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, বৌ'দি একে একে হাঁড়ি কুড়িগুলি বাহির করিয়া কলতলায় রাখিতেছেন।

MOHEARY PUBLIC LIBRA...
মহীয়াড়ি সাধারণ গ্রন্থাগার
সন ১২৯৩
EST. 18..

(৯)

আড়াই মাস কাটিয়া গিয়াছে। এখন বাড়ীতে বড় একটা থাকিনা, যতক্ষণ সম্ভব বাহিরে বাহিরেই কাটাই। বৌ'দি বলেন—দিন নেই, রাত নেই, সব সময় অমন ক'রে অজাত কুজাতের বাড়ীতে কাটাও, লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে? তোমার কিনা কোন ভাবনা চিন্তে নেই, রাধু বড় হ'ল তার ত বে' দিতে হবে, এ ত আর খ্রীষ্টানের বাড়ী না। ম্যাগো, তিরিশ বছুরে মাগীর নাকি আজও বে' হয়নি; ছিঃ ঘেন্না আর কি! এর পর কি চুল পাক্‌লে দাঁত পড়্‌লে তবে বে' হবে নাকি? হুঁ মাগীর আবার ঢং কত, জুতো শুদ্ধ মস্‌ মসিয়ে একেবারে রান্না ঘরের দোর গোড়ায়! মর্ মাগি, বড়লোক আছিস্ তুই আছিস্—

প্রায়ই এমন অনেক কথাই বলেন, কোনও উত্তর করি না। অত্যাচারের আজকাল আবার এই আর এক উপলক্ষ্য জুটিয়াছিল।

এক দিন শুনিতে পাইলাম বৌ'দিকে দাদা বলিতেছেন—হ্যাঁ, ওসব বজ্জাতি, বাড়ী থাক্‌লে পাছে কাজ কর্ত্তে হয়, সংসারের এতটুকু উপকার হয়! আর দেখেছ আজকাল কথা বল্‌লে, গোয়ার গোবিন্দর মত কেমন কট্‌কটিয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকে? সব টাকাও আজকাল হাতে দেয় না, নিজেই দশ টাকা কেটে নিয়ে পনেরটা টাকা আমাকে দেয়!

বাড়ী থাকি না, কেন থাকি না জানেন কি? যেটুকু সময় বাধ্য হইয়া বাড়ী থাকিতে হয়, নিজের মনের সঙ্গে আমাকে কতখানি ভণ্ডামি

করিয়াই থাকিতে হয়, সে খবর দাদা কি কিছু রাখেন ? 'কট্‌কটিয়ে' চেয়ে থাকি ! চাহিতে যে আজও পারি এইটাই আশ্চর্য্য নয় কি ?

যাক্ ওসব কথায় কাণ দিবার সময়ও হইত না, ইচ্ছাও ছিল না।

বোস্ সাহেবদের সহিত ঘনিষ্ঠতা আরও যেন বাড়িয়া গিয়াছে। নিজের বাড়ীতে (?) কোনও টান ছিল না, এখন এইই যেন আমার নিজের বাড়ী হইয়াছে। কলেজ হইতে বরাবর এখানে আসি, চার পাঁচ ঘণ্টা এইখানেই কাটাইয়া, আহারান্তে রাত্রি দশটার সময় দাদার বাসায় ফিরিয়া যাই। ছুটীর দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ যোল ঘণ্টা সময় বোস সাহেবের বাড়ীতেই কাটে। মিস্ বোসের সহিত পড়া শুনা করি, ক্রীড়া কৌতুকও হয়, বোস সাহেবের কাছে কখনও কচিৎ খবরের কাগজ পড়ি, নানা বিষয়ে আলোচনায় তাঁহাকে নিযুক্ত রাখি। সেই যে তিনি মাস তিন পূর্ব্বে অসুস্থ হইয়াছিলেন, তাহার পর এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া সারিতে পারেন নাই, এক একদিন বাতের যন্ত্রনায় উঠিতে পারেন না।

একদিন পড়ার ঘরে চাইল্ড হ্যারল্ডের (Child Harold) একটা অংশ লইয়া দুইজনে কথা বার্ত্তা হইতেছিল, মিস্ বোস্ হঠাৎ বলিলেন —নরেন তুমি আমাকে বাঙলা শিখিয়ে দেবে ?

—আমি আপনাকে বাঙলা শিখুবো ? আপনি কি আমার চেয়ে কিছু কম বাঙলা জানেন নাকি ?

—ছাই জানি। বাঙলায় কথা বলি, একটু আধ্‌টু লিখ্‌তে পড়্‌তে পারি এই যা, কিন্তু ভাষার জানি কি ? বাঙলা কাব্য, বড বড় লেখকদের লেখা কিছু বুঝ্‌তে পারি কি ? মিল্‌টন পড়ি, সেক্সপীয়রের এনোটেসন

করি, আর বাঙলা সাহিত্যের কোন খবরই রাখি না, এটা কি কম লজ্জার কথা !

—সে কথা ঠিক। আজকাল এম এ, বি এ পাশ করা মহাপণ্ডিতদের মধ্যে কয়জনই বা বাঙলা সাহিত্যের খবর রাখে ? জগতের কোন সাহিত্যের চেয়ে বাঙলা সাহিত্য গরীব নয়, বরং বাঙলা ভাষায় যা আছে তা পেতে অনেক সাহিত্যকেই এখনও অনেক কাল ব'সে থাকতে হবে। ইংরাজী কাব্য প'ড়ে আমরা ভাবে গলে' যাই আহাহা! বাঙলায়ও কি কাব্য নেই ? রবিবাবু গীতাঞ্জলি ত অনেক কাল আগেই লিখে ছিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে সেখানা তরজমা হবার পর থেকেই যা আদর পেয়েছে। আমিই কি খবর রাখি 'বিষ বৃক্ষ' একখানা রসাত্মক নাটক, না শুধু একটা ধুতুরো গাছের ইতিহাস ? বলতে পারিনে সেখানা বিদ্যাসাগর মশায় লিখে ছিলেন, কি চণ্ডীদাস রচনা করেছিলেন।

—যাও, যাও, ন্যাকামি কর্তে হবে না।

—ন্যাকামি কি ? হুঁ আমি নাকি আপনাকে বাঙলা শেখাব', হাসির কথা বটে !

—তবুও ? ওসব বাজে ন্যাকামি রাখ', পড়াবে কি না বল ?

—বাঃ জুলুম ত মন্দ নয় ! শক্তিতে না কুলুলে কি কর্ব্ব, শেষটা কি আপনাকে শিখুবো বিড়াল মানে মার্জ্জার অর্থাৎ যে সব মার্জ্জিত করে যেমন, ঝাঁটা বা বাঙ্গালীর বাড়ীর বাসন মাজার ঝি, তারপর ক্রমে কথাটার মানে নামতে নামতে বেরালে এসে থেমে গেছে, বেরালও কিনা বাটীতে দুধ থাকলে চেটে পুটে সাফ করে। এই রকম বাঙলা—

ফিক্ করিয়া মিস্ বোস হাসিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তখনই আবার

সম্ভবাতীত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—অমন বাঁদ্‌রামি কর যদি আমি এখান থেকে উঠে যাব, বাবাকে গিয়ে ব'লে দেব বল্‌ছি। এই শেষ বার, এখনও বল্‌ছি, বল রোজ তুমি আমায় খানিকক্ষণ ক'রে বাঙলা পড়াবে কি না ?আর বেশী কথা না, শুধু হাঁ কি না ?

—আপ্‌নি যে জেনে শু'নেও নিহাত অবুঝের মত কথা বল্‌ছেন—আপনাকে পড়াবার শক্তি কোথায় আমার? তবে বলেন ত না হয় আপনার যখন সময় হবে দুজনে এক সঙ্গে দুই একখানা ভাল বাঙলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

—ঠিক্‌ ? আজ থেকেই ? এখুনি ?

—বাশ্‌রে এত উদ্যম! ব্যাপার কি বলুন ত ? ক্রমে ক্রমে যে দেখ্‌ছি আপনি একেবারে পুরো বাঙালীর মেয়ে হ'য়ে উঠ্‌ছেন, গাউন, টুপী সব ছেড়ে দিয়েছেন, বাঙালীর মত কাপড় পরেন, হঠাৎ আবার বাঙলা সাহিত্য শিখ্‌বার জন্যে এত উদ্যম! কেন, ব্যাপার কি বলুন ত ?

একবার স্থির দৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া লইয়া, যেন উৎসাহহীন ভাবেই বলিলেন—মেমের পেটে জন্মেছিলুম, কিন্তু মা ত আমার জ্ঞান হবার আগেই ছে'ড়ে গিয়েছিলেন। তা' ছাড়া আর কিসে আমি বাঙালী না বল্‌তে পার ?

তাঁহার এ স্তিমিত ভাব ভাল লাগিল না, হাসাইবার জন্য বলিলাম —কিসে না বল্‌বো নাকি ? রাগ না করেন ত বলি

সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—বল না, রাগ কর্ব্ব' কেন ?

—তবে বলি ? আচ্ছা, অমন গোলাপী রং, বেড়ালের মত চোখ

আর কটা কটা সোনালী চুল কোন্ বাঙালীর মেয়ের দেখেছেন শুনি ?

—নাঃ আমার মত রং বুঝি আর কোনও বাঙালীর নেই, সবাই কি তাঁরা 'চম্পকবরনী' ? কটা চোখ যেন আর কারও হয় না সকলেরই যেন 'খঞ্জন-নন্দিত-কজ্জল-আঁখি' ? আমারই কেবল যা বেড়াল চোখ্। তেল না মেখে শুধু সাবান মাখ্লেই চুলের রং অমন হয় : তেল যে মাখ্তে পারিনে, কেমন চট্‌চট্ করে, নইলে দেখিয়ে দিতুম তোমাকে এই চুল আবার কেমন কাল হয়।

—দেখুন, আপনি ত এতটা বাঙালী প্রীতি দেখাচ্ছেন, সকল রকমে নিজেকে বাঙালী ক'রে তুল্‌ছেন, এতটা কি আর এক জনের ভাল লাগ্‌বে ?

—একজনের ! কিন্তু কে তিনি, আমার মাথার মণি ?

—তা' এখন কি জানি, দু'দিন পরেই দেখ্‌তে পাব'।

—চুপ, ও রকম করবে ত আমি তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ব' না। জান আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, দু তিন বছরের বড়, আমার সঙ্গে ইয়ারকি ? সন্ধ্যে থেকে পড়ার নাম নেই, খালি এই সব বাজে কথা !

নিজে একখানি বই খুলিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিলেন, যেন কত মন দিয়াই পড়িবেন।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম—বাঙালীদের ত কই বই উল্টো ক'রে পড়্‌তে দেখিনি, মুসলমানেরাই ত —

বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি সশব্দে খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমার গাম্ভীর্য্যের মুখোসও সঙ্গে সঙ্গে খসিয়া পড়িল।

আর এক দিনের কথা। ভাদ্রমাসের শেষ ভাগ, সকাল হইতেই টিপ্ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, ট্রামে করিয়া ইটিলী আসিলাম। সন্ধ্যার ঘণ্টা খানেক পরে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। আহারাদির পর বৃষ্টি থামিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একখানি ইজি চেয়ারে ঠেস্ দিয়া সিগার টানিতে টানিতে বোস্ সাহেব বলিলেন—এই রাতে বৃষ্টিতে ভিজে আজ আর নাইবা বাড়ী গেলে নরেন?

আমি বলিলাম—সবে ত এই আটটা বেজেছে, দু ঘণ্টার মধ্যেও কি জল থাম্‌বে না?

সিগারটি ছাই-দানের উপর নামাইয়া রাখিয়া, আরও একটু ভাল করিয়া ঠেস্ দিয়া, বোস্ সাহেব অলস ভাবে বলিলেন—দেখ তবে!—বোধ হয় তাঁহার ঘুম আসিতেছিল।

আকাশে কি আজ বাণ ডাকিল? ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি, কড়্ কড়্ করিয়া এক একবার মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ!

বোস্ সাহেবের নাক ডাকিতে লাগিল।

একা একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিতেছিল না—মনের মধ্যে যেন কেমন একটা কি উদাস ভাব আসিতেছিল। বোস্ সাহেব ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, মিস্ বোসও কতক্ষণ পূর্ব্বে ঘর ছাড়িয়া গিয়াছেন, চাহিয়া দেখিলাম পড়িবার ঘরে একটা খোলা জানালার সম্মুখে তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উঠিয়া তাঁহার পাশে জানালায় গিয়া দাঁড়াইলাম। গ্যাস্ ল্যাম্প্‌টির উপর ফট্ ফট্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আলোর চারিদিকে যেন কুয়াসার একটা জাল ঝুলিতেছে। ক্রোটন গাছগুলা বৃষ্টি ও বাতাসের বেগে নুইয়া পড়িতেছে, ভিজা পাতার

উপর গ্যাসের আলো চিক্ মিক্ করিতেছে। যেন আপন মনেই বলিলাম—বৃষ্টি কি থাম্‌বে না?

মিস্ বোস্ ঘরের ভিতর দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিলেন,—কি বল্লে?

—বল্‌ছিলুম কী বৃষ্টি! কতক্ষণে থাম্‌বে?

—হঠাৎ থামে ব'লে ত বোধ হচ্ছে না। এই বৃষ্টিতে গাড়ীও যেতে পার্‌বে না, না হ'লে—

—মহা মুস্কিল কর্লে ত! আপ্‌নি আর কেন ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, ঘরে যান্ না মিস্ বোস্।

কিন্তু মিনিট দুই তাঁহার কোনই সাড়া পাইলাম্ না। হঠাৎ আমার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন—নরেন্ তুমি আমাকে অমন "আপনি মশায়" ক'রে 'মিস', 'মিস্ বোস্' ব'লে ডাক্‌তে পাবে না। ক'দিন বলি বলি ক'রেও ভুলে গিয়েছি, বারণ করা হয়নি।

জানালার সার্সিটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন—চল, বৃষ্টি থাম্‌বার এখনও দেরী আছে, বসি চল।

আজ তাঁহার এরূপ অসাধারণ আদেশে বিস্মিত হইয়াছিলাম। চেয়ারে বসিয়া বলিলাম—ও কথা বল্‌ছেন কেন? আমার ওপর কি রাগ করেছেন আপ্‌নি? কি অপরাধ করেছি আমি?

—তা কেন? এম্নিই বল্‌ছি, 'আপ্‌নি মশায়' আমার ভাল লাগে না, এক বাবা ছাড়া সবারই মুখে সেই একই কথা—'মিস'—'মিস্ বোস্' শুনে শুনে আমার বিরক্তি ধরে গেছে।

—কি ব'লে ডাক্‌ব তা হ'লে আপনাকে? তবে কি শুধু দিদি ব'লেই ডাকব'?

—দোহাই তোমার, আমাকে কিছু ব'লে ডাক্‌বার তোমার দরকার নেই। কেন, আমার কি কোন নাম নেই?

রাগের কারণ বুঝিলাম না। বলিলাম—তা'ও কি হয়, আপনি যে আমার চেয়ে বয়সে বড়, অনেক উঁচুতে—

—হ্যাঁ অনেক উঁচুতে! আকাশের গায়ে নক্ষত্র আমি। বয়সে বড় বলে কি মাথা কিনেছি নাকি?

রাগ আরও বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু কেন? দুঃখিত ভাবে বলিলাম—বেশ, তাই যদি আপনার ইচ্ছে হয়, এবার থেকে আপনার নাম ধ'রেই ডাক্‌বার চেষ্টা করব'। যদিও সেটা আমার পক্ষে সহজ বা মোটেই উচিত হবে না—

আবার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, যেন অন্যমনস্কেই বলিলেন—হ্যাঁ তাই ক'রো।

ও ঘর হইতে বোস্ সাহেব বলিলেন—বৃষ্টি ধরেছে কি নরেন?

—হাঁ থেমেই এসেছে, ছিটে ফোঁটা পড়্‌ছে। এইবার বেরিয়ে পড়ি, এখনও ট্রাম পাওয়া যাবে।

একটা ছাতা যোগাড় করিয়া লইয়া বাহির হইবার পূর্ব্বে বিদায় লইবার জন্য আবার পড়ার ঘরে ঢুকিলাম—কিন্তু মিস্ বোসকে দেখিতে পাইলাম না।

হায়! তখন যদি বুঝিতাম! নিজের হৃদয়েও যে প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল, সেটা শুধু নিজের দুর্ব্বল হৃদয়ের ভ্রম মাত্র মনে না করিতাম, তখন যদি কণ্ঠরোধ করিয়া সবলে সে ধ্বনি চাপিয়া না রাখিতাম! তাহা হইলে হয়ত—থাক্ সে কথা এখন।

(৮০)

আজ মিস্ বোসের জন্ম তিথি, একটু সকাল সকাল যাইতে হইবে। নিউ মার্কেট হইতে একটা ফুলের বোকে ও বউবাজারের মোড় হইতে একছড়া বেলের গ'ড়ে কিনিয়া লইলাম, গরীব আমি, ইহার বেশী আর কি প্রেসেণ্ট্ লইয়া যাইব ?

বেলা পাঁচটার সময় ইটিলী পৌছাইয়া দেখিলাম, ইহারই মধ্যে অনেকগুলি নিমন্ত্রিতের শুভাগমন হইয়াছে। পত্রপুষ্পে ও রঙ্গিন স্ক্রীনে হল ঘরটি সুসজ্জিত, মধ্যস্থলে প্রায় ঘরজোড়া একখানি হংসডিম্বাকৃতি টেবিল, টেবিলের চারিপাশে বিশ পঁচিশখানা চেয়ার, সাদা ধবধবে টেবিল ক্লথে টেবিলখানি ঢাকা। নানা আকারের পাঁচ সাতটা ফুল-দানিতে ফুলের তোড়া, সুগন্ধি পূর্ণ গন্ধদান, জানালার একপাশে একটি পিয়ানো, অপর পাশে বড একটি টেবিল-হারমোনিয়ম্। একটি অপরি-চিতা সুন্দরী হারমোনিয়মের পর্দ্দাগুলি অন্যমনস্কে নাড়া চাড়া করিতেছেন, আর হাসিয়া হাসিয়া জানালায় দণ্ডায়মান, গোঁপ দাঁড়িহীন, পাম্পসু পাঞ্জাবী-ধারী ও চস্মা শোভিত একটি যুবকের সহিত কথা কহিতে-ছিলেন। কাগজে মোড়া ফুলের বাস্কেট লইয়া আমি ঘরে ঢুকিতে দম্পতি (?) যুগপৎ একবার ফিরিয়া চাহিলেন। বোধ হয় আমাকে বাজার সরকার বা ঐ রকমই একটা কিছু ভাবিলেন কারণ, আর দ্বিতীয় বার এদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই আবার তাঁহারা নিজেদের হাস্যালাপে মন দিলেন।

বিকাশ ও ব্যথা

নেটের স্ক্রীনের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইলাম লাইব্রেরী ঘরে অনেক ভদ্র ভদ্রাই সমবেত হইয়াছেন। এতগুলি অপরিচিত আরচিতার মধ্যস্থলে হঠাৎ কেমন করিয়া একা যাইব। বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। দ্বারের কাছে একখানা চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ও ঘরে একজন সাহেব ও তিন চারিটি মহিলা পরিবৃতা হইয়া মিস্ বোস্ বসিয়া আছেন। টেবিলের পাশে কয়টি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে একখানি বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিতেছে, বোধ হয় সেখানি ছবির বই। রকিং চেয়ারখানিতে একজন বিপুলকায়া অসিতাঙ্গী প্রৌঢ়া বপু এলাইয়া দিয়াছেন, পরিধানে তাঁহার একখানি বেগুণে রঙের চওড়াপাড় রেশমী সাড়ী, গায়ে ঐ রঙেরই একটা টাইট্ ব্লাউজ, পায়ে লাল ভেল্‌ভেটের জুতা। সম্মুখে বসিয়া মিষ্টার বোস তাঁহার সহিত গল্প করিতেছেন।

মিস্ বোস্ এ ঘরের দিকেই পাশ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন। দূর হইতে আজ তাঁহাকে সবুজ রঙের ব্লাউজ ও পার্শী শাড়ীতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল, গোলাপী গণ্ডের পার্শ্বে দালিমদানা দুলদুটি বেশ মানাইয়াছিল। সাহেব-বেশধারী যুবকটি তাঁহার চেয়ারের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, বোধ হয় সে কি একটা হাসির কথা বলিল, দেখিতে পাইলাম মিস্ বোসের আধখানি মুখের উপর হাসির একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। যুবকটির মুখে আনন্দ-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। কে এই সাহেব বেশধারী? কই এতদিন যাওয়া আসা করিতেছি ইহাকে ত আর কখনও দেখি নাই। এত ঘনিষ্টতা! একটা সাইড় টেবিলের উপর ফুলের বাসকেটটি তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে

আসিলাম। আজ এখানে আমার উপস্থিতি বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। ইহারা সকলেই আমার অপরিচিত অপরিচিতা, দেশীয় বিদেশীয় মহার্ঘ বেশ ভূষার ভিতর দিয়া ইহাদের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন ফুটিয়া উঠিতেছে, সকলেই বোধ হয় আলোকপ্রাপ্ত নব্য-সমাজের এক একটি মুকুটমণি। আর আমার এই হীন বেশ, কুসংস্কারান্ধ, সশঙ্ক হৃদয়, বিসদৃশ হইবেই ত!

সিঁড়ির একধারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম—সুযোগ মত বোস্ সাহেবের সহিত দেখা করিয়া ও মিস্ বোস্‌কে ফুলের তোড়াটি দিয়া আজিকার মত বিদায় লইব।

ফটক পার হইয়া একখানি মোটর ভিতরে ঢুকিল, খান্‌সামা খবর দিতেই বোস্ সাহেব বাহিরে আসিলেন। মোটর হইতে সাহেব বেশী একটি বৃদ্ধ ও একজন প্রৌঢ়া বাঙ্গালী রমণী নামিলেন। বোসসাহেব সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতেই হাত বাড়াইয়া সানন্দে তাঁহাদের সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন। সিঁড়ির ধারে চীনা-পামের টবটির পাশেই আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম অতিথিদের সঙ্গে লইয়া ভিতরে ফিরিবার সময় আমার উপর দৃষ্টি পড়িতে বোস সাহেব বলিলেন—হ্যালো ঘোষ, কখন এলে, ওখানে দাড়িয়ে কেন? এস এস এঁরা সবাই আমার অনেক দিনের বন্ধু, অত লজ্জা কিসের?

তাঁহাদের পিছনে পিছনে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিলাম। মিস্ বোসের সহিত চোখচোখি হইতে তিনি একটু হাসিলেন মাত্র, উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাগতদিগকে অভিবাদন করিলেন, নিজের চেয়ারখানি দেখাইয়া দিয়া নবাগতাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

নবাগতা আসন গ্রহণ করিয়া, আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিলেন—একি! এমন রোগা হ'য়ে গেছিস্ নীলি? অমন রঙ, একি হ'য়ে গেছে? আর বাপু তোদের এক পড়াতেই অস্থির কর্লে, দিন নেই রাত নেই খালি বই'য়ে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাক্‌লে কি শরীর থাকে? যাদের যা তা'দেরই সাজে, সেকেলে লোক আমরা আমাদের বাপু অত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না। রুমীটা সেও অম্নি রাতদিন বই নিয়েই আছে!

অপ্রতিভভাবে মিস্ বোস বলিলেন—আমার আবার পড়া, নামমাত্র। কই রোগা আবার কোথায় হলুম, দিন দিন ত বেশ মোটাই হচ্ছি। বাবা আপ্‌নিই বলুন ত আমি আগের চেয়ে অনেক মোটা হই নি কি?

বোস সাহেব সস্নেহে একটু হাসিলেন।

—হুঁ মোটা হয়েছিস্! বল্লেই আমি শুনি কিনা? আচ্ছা বল্‌ত তুই আমাদের ওধার আর মাড়াস্‌নে কেন? আগে আগে ত কতই যেতিস্, আর আজকাল, রায়পিসি আছে কি কবরে গেছে একবার খবরও নিস্‌নে। রুমীকে রোজই তোদের খবর জিজ্ঞেস্ করি, সত্যি বল্‌ছি, ছেলে বেলায় তোর মা স্বর্গে গেল, তোর জন্যে আমাদের সবারই মন পোড়ে, আহা বাড়ীতে যদি মাসি পিসি আর একটা মেয়ে মানুষও থাকৃত'! সময় সময় মনটা বড় কেমন করে, ইচ্ছে হয় যাই ছুটে দেখে আসি, কিন্তু সংসারের ঝন্‌ঝটে আস্‌বার যো আছে কি ছাই। তার সাক্ষী এই দেখ্‌না কেন, আজ একটু সকাল সকাল এ'সে কোথায় কর্ব্বো কর্ম্মাবো, তা না ছোট মেয়েটার এমন দাঁত চাগাল', যন্ত্রণায় একেবারে

ছট্‌ফট্ কর্ত্তে আরম্ভ কর্লে। হেম ত তার ওপর চটেই অস্থির, আস্‌তে দেরী হতে লাগল' কি না।

স্নেহ-গর্ব্বে এবার তিনি মিস্ বোসের পার্শ্বস্থিত সাহেব বেশধারীর দিকে চাহিলেন, যুবকের মুখখানি যেন লজ্জায় একটু লাল হইয়া উঠিল।

—তোকে দেখ্‌বার জন্যে হেম কি ব্যস্তই হ'য়েছিল! এই ত সবে কাল বিকেলে কল্‌কাতায় পৌঁছিয়েছে, জাহাজ থেকে নেমে বোম্বায়ে আর এক দিনের জন্যও দাঁড়ায় নি। কাল সন্ধ্যে বেলাই ছুটছিল এখানে, রুমী বল্‌লে—দাদা একটা সারপ্রাইজ' দেওয়া যাবে, বেশ মজা হবে।' সমস্ত দুপর আজ দু'টোতে রোদে ঘুরে ঘুরে কোথায় লাবচাঁদের দোকান, আর কোথায় হগ সায়েবের বাজার ক'রে বেড়িয়েছে। সবাই মিলে তিন্‌টের সময় বেরুব এমন সময় সমীটা গোল বাঁধালে। শেষটা বুড় বুড়িকে ফেলেই ওরা দুজনে চ'লে এল।

স্থূলকায়া মহিলাটি চস্‌মার পাশ দিয়া অপাঙ্গে হাসিতেছিলেন, আরও দুই একখানি মুখে বুঝি একটা হাসির ইসারা চলিতেছিল, লক্ষ্য করিয়া হেম লজ্জিত অপ্রস্তুতভাবে বলিল—আঃ তুমি এখন থাম' দেখি মা, একবার কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্লে আর বিরাম নেই! সব কথা বাড়িয়ে বলা যেন তোমার কি অভ্যেস!

—কী, বাড়িয়ে বলা আমার অভ্যেস? আচ্ছা বলুক ত রুমী, আমি কোন কথা বাড়িয়ে বলেছি না তুই এখন লজ্জায় মা'র নামে খপ্ করে' একটা বদনাম দিচ্ছিস্?

—আহাহা! তোম্‌রা মায় দু'জনেই পোয় দেখ্‌ছি আসর জমিয়ে

তুল্‌লে, আর কাকেও কি তোমরা কথা বল্‌তে দেবে না? আরও পাঁচজন ভদ্র মহোদয়েরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন ভুলে যাচ্ছ' যে।

রায় মহাশয় স্ত্রী ও পুত্রের কথায় মধ্যস্থতা করিলেন।

স্থূলকায়া রমণী বলিলেন—তা হ'ক তা হ'ক, বলুন না, বলুন না ওঁরা কথাবার্ত্তা।

সকলেই তাঁহার দিকে ফিরিল, কথাটা সহজ ভাবে বলিলেও বোধ হয় তাঁহার নাতিক্ষুদ্র মুখখানির কোনখানে একটু বিদ্রূপের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং এবার অনেকগুলি মুখেই মুচ্‌কি হাসি দেখা দিল মা'য়ের নির্ব্বুদ্ধিতায় হেমের অন্তর বুঝি আগুন হইয়া উঠিয়াছিল, কটমট দৃষ্টিতে সে একবার মা'য়ের মুখের দিকে চাহিল।

বোস সাহেব বলিলেন—আজ আনন্দের দিনে একটা গান্‌ টান্‌ হ'লে—

—বিলক্ষণ, হবে বৈকি, এত সব গায়ক গায়িকা উপস্থিত, আর গান হবে না, বলেন কি মিষ্টার বোস?

আবার সেই স্থূলকায়া রমণী। প্রত্যুত্তরে বোস সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তবে দয়া ক'রে আপনারা একবার হল ঘরে আসুন, এখানে জায়গা হবে না ব'লে ওঘরেই পিয়ানো টিয়ানো গুলো—

—তা চলুন ওঘরেই যাওয়া যাক্।

এক পাশের দিকে একখানি খালি চেয়ার দেখিয়া বসিয়া পড়িয়া ছিলাম, এতক্ষণ ইহাদের ঐ সব কথাবার্ত্তা আমার একটুও ভাল লাগিতেছিল না। এবারে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইতে আমিও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। সকলে উঠিয়া হল ঘরে ঢুকিলেন, কিন্তু আমাকে কেহ

লক্ষ্য করিলেন না, পরিত্যক্ত চেয়ার খানিতে আবার আমি বসিয়া পড়িলাম। এ ঘরে এতক্ষণ অনেকগুলি লোকই ছিলেন কিন্তু কি জানি কেন আমার দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার হেম রায়ের দিকেই যাইতেছিল। পোষাক পরিচ্ছদের তাহার যথেষ্ট পরিপাটী—নিখুঁত সাহেবেরই মত, গায়ের রঙটা বোধ হয় প্রথমে কালই ছিল, তাহার পর বিলাতে গিয়া সাবান ঘসিয়া ঘসিয়া এখন সেটা বেগুনেতে দাঁড়াইয়াছে। রোগা ছিপ্ ছিপে চেহারা, মুখে গোঁপ দাড়ির চিহ্নমাত্র নাই, বয়স কত অনুমান করা যায় না। মিস্ বোসের চেয়ারের দিকে ঝুঁকিয়া যখন সে কারণে অকারণে হাসিতেছিল, মনের মধ্যে আমার বড়ই রাগ হইতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, সেখান হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া যাই।—কিন্তু বোস্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব, তা ছাড়া ফুলগুলা যে অনেক আশা করিয়া আনিয়াছিলাম—

ও ঘরে পিয়ানোর ঝঙ্কার উঠিল, মোটা গলায় কে গান ধরিলেন, গানের একটা কথাও বুঝিলাম না। বোধ হয় ইংরাজী গান হইবে, নহিলে এমন বেয়াড়া চিৎকার! উঁকি দিয়া দেখিলাম, হেম রায় পিয়ানোতে বসিয়াছে, মিস্ বোস ও আর একটি যুবতী—মিস্ রায় বোধ হয়, পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। চীৎকার থামিল, সঙ্গে সঙ্গে করতালিধ্বনি, ছাদ বুঝি ফাটিয়া পড়ে। দু' মিনিট না যাইতেই আবার পিয়ানো বাজিয়া উঠিল। এবার না জানি কি গানই—

Oh—O—Sweet and bright
Be Thine days and night

Oh—

বাপ্ রে! একি গান, না নাকিস্বরে কান্না! গলার মধ্যে কি কাঁসর বাজিতেছে নাকি!

পূর্ব্বে কখনও সাহেব মেমের গান শুনি নাই, আজ প্রথম, বড়ই অদ্ভুত শুনাইল। কি করিব মন্দভাগ্য আমার তাই এমন সঙ্গীতসৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা হইল না।

আবার সজোরে অধিকতর উদ্যমে করতালিধ্বনি—ফট্‌ফট্‌। শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনি থামিয়া গেলে শুনিতে পাইলাম, মিস্ বোস্ প্রতিভ-ভাবে কি কথায় আপত্তি জানাইতেছেন। হেম বলিয়া উঠিল—

That won't do to-night my friend, you must—

সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী কণ্ঠে আর কে বলিল—গাও না মা, গাও। সবাই বল্‌ছেন, আর আজ তোমার জন্মতিথি, গাও। ইংরেজী না গাইতে চাও বেশত, বাংলা গানই না হয় গাও একটা।

টেবিল হারমোনিয়মের শব্দ উঠিল। কতক্ষণ ধরিয়া একটা স্বর বাজিতে লাগিল তাহার'পর মিস্ বোস গাহিলেন—

আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে
আমার সকল অহঙ্কার হউক হে চূর্ণ হৃদিপদ্ম দলে।

পূর্ব্বে অনেক বার মিস্ বোসকে এই গানটিই গাহিতে শুনিয়াছি, খুবই ভাল লাগিত, কিন্তু আজ যেন কাণে কেমন শুনাইতে লাগিল, কি জানি কেন! গান থামিল সকলেই প্রশংসা করিয়া উঠিলেন!

বড় বড় ডিস্ ও 'বোলে' করিয়া খাদ্য সামগ্রী আসিয়া টেবিলে জমা হইতেছিল, আজ নানা রকমের দেশী বিলাতী খানা।

মিস্ বোস ব্যস্তভাবে এই ঘরের ভিতর দিয়া নিজের ঘরে যাইতে-

ছিলেন, আমাকে এমন করিয়া একা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন —অন্যায় কিন্তু—

—কি অন্যায় কিন্তু?

উত্তর না দিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—আস্‌ছি এখুনি—এক মিনিট—।

মিনিট পাঁচের মধ্যেই সাদা পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া মিস্ বোস ভিতর হইতে বাহির হইলেন, বলিলেন—খাবে চল,' ওঠ'।

বুকের ভিতর সেই বৈকাল হইতে একটা অভিমান কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিয়াছিল—বলিলাম না, আজ আর খাব না।

একবার ও ঘরে টেবিলের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিলেন—ওঃ! আচ্ছা। কিন্তু আমাকে না জানিয়ে পালিও না যেন।

—ওঘরে কোণের টেবিলে—আমার বক্তব্য শেষ হইল না।

—মিস্ বোস কই? এবার তা হ'লে Prayerটা হ'য়ে যাক্ না।

সুতরাং ত্বরিত পদে মিস্ বোস হল ঘরে চলিয়া গেলেন। আমার আর বলা হইল না, ওঘরে কোণের টেবিলে আপনার জন্য গরীবের সামান্য উপহার রাখা আছে।

প্রার্থনা শেষে ভোজ আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার ধরিয়া ভোজন চলিতে লগিল। হেম রায়ের কণ্ঠস্বর বার বার আসিয়া কাণে বিঁধিতে লাগিল। বসিয়া বসিয়া নিজের উপর, মিস্ বোসের উপর—সকলেরই উপর আমার রাগ হইতে লাগিল। আর কতক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিব। আমি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াও তিন ঘণ্টা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম তারপর সমস্ত সন্ধ্যা এক কোণে চুপ

করিয়া অনাহারে বসিয়া বসিয়া ওঘরে আনন্দ কোলাহল ও ভোজন উৎসব চোখেই শুধু দেখিতে থাকিব! মিস্ বোসের আর আজ যে একটি কথা বলিবারও অবসর নাই—আমি উঠিয়া পাশের বাথ্রুমের ভিতর দিয়া একটা হেনা ঝোপের পাশে নামিয়া পড়িলাম।

বাড়ী আসিয়াও কত রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া কি যে এত ভাবিলাম, তাহার কোনও কুল কিনারা রহিল না।

---

(১১)

পূজার ছুটী হইয়াছে।

রাত্রে খাইতে বসিয়াছি। আজ ক'য়দিন হইতে রাত্রেও বাড়ীতেই খাইতেছিলাম; বৌ'দি বলিলেন—সকালে যেন কোথাও বেরিয়ো না, নৈহাটীর ওঁরা কাল তোমায় দেখ্‌তে আসবেন।

আমাকে নৈহাটী হইতে দেখিতে আসিবার মত হঠাৎ এমন কি একটা নূতনত্ব হইল! আমার বিস্ময় ভাব দেখিয়া বৌ'দি বলিলেন—হাঁ ক'রে চেয়ে রইলে যে! তোমার যে বিয়ের কথা হচ্ছে? বলে কি, যার বে তার মনে নেই, পাড়ার লোকের ঘুম নেই। কোন খবরই কি তুমি রাখ না? রবিবারে উনি নৈহাটীতে মেয়ে দেখ্‌তে গেছ্‌লেন; খুব বড়লোক তারা, বাড়ীখানাই বা কত বড়, গাড়ী ঘোড়া, দশটা চাকর বাকর, দেউড়ি আগলে দু'দুটো দরোয়ান! তোমার দাদাকেই বা কি খাতির যত্ন! বল্‌ছিলেন—পাঁচ ছ' হাজার টাকাত তারা না চাইতেই দেবে, তারপর চাপ চোপ দিলে আর কোন্ দু'এক হাজার আদায় হ'য়ে না আস্‌বে?

ভীত ভাবে বলিয়া উঠিলাম—বিয়ে? আমার বি'য়ে? অসম্ভব, হতেই পারে না কখনো না।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ তোমার বে' না ত কি তোমার দাদা নিজের বে'র ক'নে দেখ্‌ছেন নাকি? অমন্ আঁৎকে উঠ্‌লে যে? বলি আর কত কাল আইবুড় কার্ত্তিকটি থাক্‌বে শুনি? ইচ্ছে ক'রে যদি তুমি কাজ কর্ম্ম

না কর, তা হ'লেত আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, লোকে বল্‌তে যে আমাদেরই বল্‌বে, তোমার আর কি? আর এদিকে তুমি যে রকম বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছ, তা'তে সত্যিই কোন্ দিন খৃষ্টান মিষ্টান হ'য়ে না যাও। বাবা কী ঢং মাগীর? ওঁদের অপিসেও ত কত মেম্ ওঁদের নীচে কাজ ক'রে, খাঁটী মেম্ তা'রা এমন কলপের চারা না ত, উনি বলেন তা'রা নাকি এত বেহায়া না।

—ওকি ভাত ফেলে উঠ্‌চ' যে, ইস্ ভারী দরদ! আমার ঘাট হয়েছে বাপু, আর অত ঝাল দেখিয়ে কাজ নেই। আমায় বল্‌তে বলেছিলেন, তাই বলা, নইলে তুমি রাত না পোহাতেই কোন্ খৃষ্টান বাড়ী—কি কোথায় চ'লে যাও আমার বারণ কর্‌বার এত কি মাথা ব্যথা ছিল। বলিই ত তোমার দাদাকে—ভাই এবার খৃষ্টান হ'ল, হুঁ এ মাগীর কথা সত্যি কি মিথ্যে এবার টের পান'।

মুখ ধুইয়া বাহিরের ঘরে চলিয়া আসিলাম। একি আবার নূতন উৎপাত! আমার বিবাহ! অসম্ভব! নিজের ভার নিজে বহিবার যাহার ক্ষমতা নাই, যাহার মা অনাহারে রোগে পড়িয়া অচিকিৎসায় মারা যায়, তাহার আবার বিবাহ! এমনই সংসারের যাহা দেখিতেছি ভুগিতেছি তাহার উপর—হুঁ বিবাহ করিলাম আর কি!

কথাটা তখনকার মত মনে মনে উড়াইয়া দিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপারটি এইখানেই শেষ হইল না। কতক্ষণ পরে উপর হইতে দাদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘরের বাহিরে দ্বারের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

—এ রকম ক'রে পদে পদে আমাকে অপদস্থ অপমানিত করাই কি তোমার উদ্দেশ্য নাকি? পাশ করেছ, বি এ পড়্‌ছ',কাকেও আর গ্রাহ্যের

মধ্যে আন না দেখ্‌ছি। এখন তা' হবে বৈকি, মানুষ হয়েছ, নিজের পথ নিজে দেখে নিতে শিখেছ', কারও তোয়াক্কা রাখ্‌বার তোমার আর দরকার কি? এখন আমাদেরই বরং তোমার খোসামোদ ক'রে চল্‌তে হবে। তবে ব'লে রাখছি,মনেও জায়গা দিও না যে দাদা তোমার কোনও প্রত্যাশা রাখে,তুমি রোজগার ক'রে এনে দেবে এ দুরাশা আমি মনেও রাখি না। ছেলে বয়সেই বাবা মারা গেছ্‌লেন, নিজের পড়া শোনা ছেড়ে দিয়ে বড় হবার আশা না রেখেই সংসারের ভার আমাকেই ঘাড়ে নিতে হয়েছিল, তার পর এতদিন মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে নিজে না খেয়ে না প'রে তোমাদের ক'রে আস্‌ছি। যাক্‌ আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি, এখনও কর্চ্ছি, সেটা যদি ভুলে যাও, না মান্‌তে চাও, তার আর কথা কি? এই সে দিন মায়ের শ্রাদ্ধ নিয়ে, আত্মীয় স্বজনের কাছে, আমাকে কী অপদস্থটাই না কর্লে তুমি? তার পরেও যে তোমার মত ভা'য়ের মুখ দেখ্‌ছি, নিলর্জ্জের মত তোমার কথায় মাথা দিতে গেলুম, তার উচিত শিক্ষাই হয়েছে এবার,—মুখের মতই জুতো হ'য়েছে। ভদ্রলোক-দের কথা দিয়ে এসেছি, এখন তাঁদের কি ব'লে বিদায় করব'—যাক্‌ জুতোই যখন খেতে পার্ল্লুম চুপ ক'রে, তখন আর দাগ লুকুতে চাইলে চল্‌বে কেন? স্পষ্টই তাঁদের বল্‌তে হবে—না মশায়, আমায় মার্প কর্ব্বেন, ভায়ের অনুমতি না নিয়েই আপনাদের আস্‌তে বলেছিলুম, অপরাধ হয়েছে, আপনারাও না হয় আর দু ঘা জুতো মেরে যান্‌।

নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম, এসব কথার যে কোনও উত্তরই ছিল না মনে মনে ত জানিতাম—যাক্‌ মনের কথা মনেই থাক, প্রকাশ করিয়া শেষটা আরও একটা কেলেঙ্কারী বাঁধাইব।

ক'তক্ষণ পরে দাদা আবার বলিলেন,—কেমন, তাই বলেই কাল তাঁদের বিদায় কর্ব্ব' ত? আমার আর মান অপমান কি, মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমি!

এবার উত্তর করিলাম, স্বাভাবিক নম্র ভাবেই বলিলাম—বিয়ে আমি কর্ব্ব' না, আমায় মাপ কর্ব্বেন।

—কখনোও না?

—এখন ত নয়ই। নিজের ভার বইবারই যখন ক্ষমতা নেই আমার, তখন অনর্থক কেন আপনাদের—

—শুন্‌লে কেমন বাঁকা বাঁকা কথা,—বৌ'দির তখনকার রাগটা বোধ হয় এখনও পড়ে নাই, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে, ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—শুন্‌লে কেমন বাঁকা বাঁকা কথা? এ'তে কার না পিত্তি জ্বলে যায়? ওঁয়াকে আমরা খেতে দিচ্ছি না, না, পর্ত্তে দিচ্ছি না, তাই অমন ঠেস্ দিয়ে কথা বলা? এই সব কথা রটিয়ে লোকের কাছেও আবার দাদার মুখে চুণ কালি দিয়ে বেড়ান্ উনি, কি আমার লক্ষ্মণ ভাইরে! ও সব কিছু না গো, ও সব কিছু না, শুধু হিংসে আর হিংসে। নইলে দাদা নিজে উপ্‌জে বে'র সম্বন্ধ কর্চ্ছেন, বড় ঘরে বে' দিয়ে ভা'য়ের একটা হিল্লে ক'রে দেবার চেষ্টায় আছেন, তাতে এমন ক'রে বেঁকে বস্‌বার কি কারণ হ'ল এমন? পাছে দাদা বে' দিয়ে টাকা গুলো নিজে হাতিয়ে নেয় সেই ভয়, তা নয় ত আর কি?

ছিঃ এসব কি কথা! দাদা আমাকে খাইতে পরিতে দেন না, আমি তাই লোকের কাছে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াই, আমার বিবাহ দিয়া তিনি টাকা আত্মসাৎ করিতে চাহেন, সেই ভয়ে আমি বিবাহে

সম্মত নই, এ সব কি কথা ? শত কষ্ট পাইলেও, আঘাতে আঘাতে বুক ফাটিয়া গেলেও, কই কখনও ত কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া দাদার ব্যবহারের এতটুকু প্রতিবাদ অভিযোগ করি নাই। আর করিলেই কি লোকে আমার দুরবস্থায় গলিয়া গিয়া আমার সাহার্য্য করিতে ব্যাকুল হইত ? বিবাহে টাকা লওয়া না লওয়ার কথা দূরে থাক্, আমার এখনই বিবাহ হইতে পারে এমন একটা সম্ভাবনাও ত এই একটু পূর্ব্বেও আমার কল্পনাতেও ছিল না, তবে এমন একটা কুৎসিত কথার সৃষ্টি হইল কোথা হইতে ? বুঝিলাম, নিজের রিষেই বৌদি এমন করিয়া বিষ-উদ্গার করিলেন ! কিন্তু কেন, অনেক সময়েও ভাবিয়া পাইতাম না, আমার উপর বৌদির এই অহেতুক বিরূপভাবের কারণ কি ?

মনটা আজ বড়ই তিক্ত ঠেকিল, কোনও কথা বলিলাম না, বৌদির এ অলীক আপবাদেরও কোন প্রতিবাদ না করিয়া নীচে আসিলাম।

অন্ধকার ঘরে শুইয়া শুইয়া অনেক কথাই মনে উঠিতে লাগিল। একটা সামান্য উপলক্ষ্য ধরিয়া কতখানিই না গরল উঠিল। কেন এমন হয় ? শুধু যে আজ বিবাহে অমত জানাইয়াছি বলিয়া এমন তাহা ত নয়। চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, আমাকে বেড়িয়া এমন একটা অশান্তি কুজ্ঝটিকা ত লাগিয়াই আছে। কেন আমার কি অপরাধ ? ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিতৃহীন হইয়াছিলাম, সে দোষও কি আমারই ? আজ আবার মায়ের কথা মনে পড়িল, মনে পড়িল ছেলে বেলায় তাঁহার অনাদর—যাক্ তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, মিথ্যা অভিমান। জ্ঞানহীন অবস্থায় দাদার গলগ্রহ হইয়াছিলাম, বোঝাটা যদি এতই ভার বোধ হইয়াছিল, তবে তখনইত ছুড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেই

হইত, কেহ দয়া করিয়া উঠাইয়া লইত ভালই, না হয় দুর্ভাগ্যের চাপে পিসিয়া পিসিয়া ধূলার বোঝা ধূলা হইয়া যাইতাম! তারপর এখন ত আর সত্য সত্যই দাদার ঘাড়ের উপর আমি পাথর হইয়া চাপিয়া রহি নাই, এখনও তবে তাঁর এ বিরূপ ভাব কেন? সত্যিই কি তবে এখনও ইঁহারা আমাকে ভার বোঝা মনে করেন? হয়ত তাহাই হইবে। কিন্তু তবে আবার আমার এই অক্ষম পরগলগ্রহ অবস্থায় নিজেরা ইচ্ছা করিয়া অকারণ আর একটা বোঝা চাপাইয়া নিজেদেরই ভারবৃদ্ধি করিবার জন্য দাদা-বৌদির হঠাৎ এত আগ্রহের কারণই বা কি? দাদা ত কথায় কথায় আমাকে দিন রাত বলিয়া থাকেন—তোমার কাছে কোন প্রত্যাশাই আমি রাখি না। তাই কি? অর্থের জন্য মানুষ যে সবই করিতে পারে, এই অর্থের জন্যই না, দাদা সমর্থ হইয়াও মা'কে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, কত কষ্ট দিয়াছিলেন, সে ত নিজের চোখেই দেখিয়াছি। হাঁ, তাহাই বটে দাদা আমার বিবাহ দিয়া একটা মোটা দাঁও হাতাইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু আমার মত এমন সহায়-সম্পদহীন অকর্ম্মণ্যকে কেহ দয়া করিয়া কন্যা দান করিলেই যথেষ্ট, তাহার উপর আবার এক আধটি নয়, প্রচুর অর্থ! কি জানি হয়ত সম্ভবও হইতে পারে, নহিলে বৌ'দি আপনা হইতে অমন একটা অসম্ভব কল্পনা গড়িয়া তুলিয়া শ্লেষ উক্তিই বা কেন করিলেন? যাক্, কারণ যাহাই হউক, ইঁহারা আমার দুর্ভাগ্য বৃদ্ধি করিতে ও একটি নিরাপরাধ বালিকার জীবন বলি দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিলে রুষ্ট হইবেন, এখনইত তাহার যথেষ্ট নমুনা দিয়াছেন।

বিকাশ ও ব্যথা

বিবাহ করিব ! হাঁ, নিজের জীবনটাকে কত আরামেই কাটাইতেছি না, একা যে আর এত আরাম ভোগ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না ! এখন একটি অংশভাগীর দরকার হইয়াছে ! কত সুখের সংসার আমাদের, শান্তি উছলিয়া পড়িতেছে, এই সংসারে আমি সংসার পাতিব না ? পাতিব বৈকি !

বিবাহ করিব, সংসার পাতিব, এসব কল্পনা করিবার আমার এত দিন অবসরও হয় নাই, অভিরুচিও ছিল না। যে যাহাই বলুন,—বলাত আমার অঙ্গের ভূষণ, শুনিয়া শুনিয়া কাণ বধির হইয়া গিয়াছে, এখন আর প্রাণে গিয়া কোন কথাই পৌঁছায় না—বিবাহ আমি করিবই না ! এতদিন এত সহিয়া, ভিতরের এত বিকর্ষণ বাহিরের কত আকর্ষণ সমস্ত উপেক্ষা করিয়াও কর্ত্তব্য ভুলি নাই, নিজের কক্ষ-ত্যাগ করি নাই, এবার না হয় তাহাও করিব ; কিন্তু বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব।

মনের মধ্যে এই সব কথা লইয়া তোলাপাড়া করিতে করিতে অধিক রাত্রে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, সকালে বেশ একটু বেলা হইলেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মত মুখহাত ধুইলাম।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কলেজের নোট্ কপি করিতে বসিব কি, প্রথমে বাজারটা সারিয়া আসিয়া পরে পড়িতে বসিব, ভাবিতেছি, এমন সময় বাহিরে কে কড়া নাড়া দিয়া ডাকিল—সুরেন বাবু আছেন, সুরেন বাবু ?

দরজা খুলিয়া দিতেই দুজন হোম্‌রা চোম্‌রা ভদ্রলোক ভিতরে

উঠিয়া আসিলেন। বাহিরের ঘরে আমার খাট খানিতে বসিতে বসিতে একজন বলিলেন—সুরেন বাবুকে একবার ডেকে দেবেন।

রাধুকে দিয়া উপরে খবর পাঠাইলাম। অবশ্য ইতিমধ্যেই দাদার কাছে এই ভদ্রদ্বয়ের আগমন সংবাদ পৌঁছাইয়াছিল, এবং ইহারা কে, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন সে খবর বুঝিতেও অবশ্য তাঁহার দেরী হয় নাই, কিন্তু কেন যে তিনি এতক্ষণ নীচে নামিয়া আসেন নাই কি জানি। রাধু গিয়া ডাকিতেই দাদা ব্যস্তভাবে নীচে নামিয়া আসিলেন।

যথাপ্রথা দুই চারটি কথাবার্ত্তার পর একজন আগন্তুক বলিলেন—তা হ'লে এবার একবার আপনার ভায়াকে—

দাদা আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—এইটিই আমার কনিষ্ঠ—

—ওঃ বটে! তা ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হ'য়ে গেছে, উনিই ত আমাদের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। বেশ্ বেশ্।

তাহার পর প্রায় আধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া ভদ্রলোক দুইটি আমাকে নানা রকমে নাড়িয়া চাড়িয়া অনেক করিয়া বাজাইয়া দেখিলেন। উত্তর না করা অভদ্রতা হয়, কাজেই সব কথার যথাযথ উত্তর করিতে হইল।

একজন বলিলেন—তা' ছেলে অপছন্দের কিছুই নেই, না দেখ্‌লেই চলত, তবে একটা প্রথা এই যা। এখন দু পক্ষেরই ত পাত্র পাত্রী পছন্দের হাঙ্গাম মিটেছে, এবার আর যা কিছু আপনার ওপরেই নির্ভর কর্চ্ছে, দেনা পাওনাটার একটা চুক্তি হলেই এখন হয়। নগদে ও গহনা বরসজ্জা বাবদ সর্ব্ব সমেত আমরা চার হাজার টাকা খরচ কর্ত্তে পার্ব্ব', তার বেশী হ'লে পারা সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌বে না, ভদ্রলোকের এখনও তিনটি মেয়ের বিয়ে দিতে বাকী, জানেন ত আপনিও সংসারী লোক, আজ-

কাল মেয়ের বে দেওয়া না ত, সর্ব্বস্বান্ত হওয়া। এ বিষয়ে বেশী কথা বলা বাহুল্য, আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আপনার দয়ার ওপরেই এখন সব নির্ভর কচ্ছে, এ বিষয়ে আপনার কি মত জান্‌তে পারি কি? সাম্‌না সাম্‌নিই এসব বিষয়ের একটা বোঝা পড়া গোড়াতেই ক'রে নেওয়া ভাল।

একি হাট বাজারে বলদ বিক্রয় নাকি! আমারই সম্মুখে আমার দর দস্তুর হইতেছে! উঠিয়া যাইবার কোনও সুযোগই পাইলাম না, কেহ্ অনুমতি না দিলে হঠাৎ কি করিয়া উঠিয়া যাই? কাজেই পণ্য-দ্রব্যের মত ক্রেতা বিক্রেতার সম্মুখে আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই হইল।

দাদা বলিলেন—দয়ার কথা কি বল্‌ছেন! মহোদয় লোক আপনারা, ওকথা ব'লে আর অধমকে লজ্জা দেন কেন? তবে একটা কথা হচ্ছে এই, ভায়ের এখন বিবাহে মত নেই, আমারও তেমন কিছুই তাড়া ছিল না, তবে মোহন বাবুর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় তিনি যখন অনেক ক'রে পীড়াপিড়ি কর্চ্ছেন, তখন বাধ্য হ'য়েই আমাকে উদ্যোগী হ'তে হয়েছে। মেয়ের বিবাহে টাকা দেওয়া অবশ্য বড়ই কষ্টকর কিন্তু ছেলের বিবাহও যদি গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে দিতে হয় তবে সেটা কি বড়ই গায়ে ঠেকে না? তাই বল্‌ছিলুম কি, আপনারা ত চার হাজার টাকা নিজ মুখেই দিতে চাইছেন, তা ও টাকাটা আপনারা নগদই দেবেন, বড়লোক আপনারা, মেয়ের গায়ে যা গয়না আছে তা'ত আর খুলে নিতে পার্‌বেন না, তা সে কোন্ হাজার দেড়েক টাকার না হবে, আর দান সামগ্রী বরসজ্জা বাবদে পাঁচ শ টাকা ধরে দেবেন। মহাশয়;

ব্যক্তি আপনারা, আপনাদের কাছে কথা বলাই আমার ধৃষ্টতা; তবে আপনারা যখন দয়া করেই গরীবের ঘরে মেয়ে দিতে ইচ্ছুক হয়েছেন, তখন গোড়াতেই একটা বোঝা পড়া ক'রে নেওয়াই বিধেয়, পশ্চাতে আর কোনও মনোমালিন্যের কারণ না হয়। শুনেছেনইত ছেলে বেলাতেই বাবা মারা যান, ভাইকে বি এ পড়ানর মত অবস্থা আমার নয়, অনেক সময় অবস্থায় কুলোয়নি, ধার ধোর ক'রে পড়া শুনোর খরচ যোগাতে হয়েছে, তাই আমার নগদ চাওয়া; নইলে আর কথা ছিল কি। লেখা পড়া শিখিয়ে ভায়াকে মানুষ ক'রে তুলেছি, এখন দেখে শুনে একটা বে থা দি'য়ে তাকে কাজে বসাতে পাল্লে'ই আমার ছুটি।

—বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, আপনাকে ত আবার এখনিই বেরুতে হবে। তা এ সব কথা এখন থাক্, মোহন বাবুর কাছে কাল অপিসেই খবর পাবেন। বাড়ী গিয়ে নিজেদের ভেতর ত এ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ক'রে দেখ্‌তে হবে। আচ্ছা, মশায় নমস্কার, আমরা তা হ'লে এখন—

—নমস্কার, হাঁ কি বলে—গরীবের বাড়ীতে যখন পায়ের ধূলো দিলেনই তখন একটু মিষ্টি মুখ—

—হেঁ, তার আর আক্ষেপ কি, কুটুম্বিতে হলেই তখন একবার ছেড়ে দু'শোবার মিষ্টিমুখ কর্ত্তে হবে। অবনী বাবু চলুন চলুন, আর দেরী কল্লে ন'টা চল্লিশ ধরা যাবে না, তার পর একেবারে সেই বার'টায় ট্রেন্।

তাড়াতাড়ি তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন। যাক্ উপস্থিত ত ঘামদিয়া জ্বর ছাড়িল, পরের কথা পরে।

কিন্তু এ কেমন হইল? কাল রাত্রে স্পষ্টইত দাদাকে জানাইয়াছি, এখন আমার বিবাহে রুচি নাই, কিছুতেই বিবাহ করিব না, তবে আবার দেনা পাওনার কথা বলিয়া—ছয় হাজার টাকা চাই, এ সব বলিয়া ভদ্র লোকদের এখনও ঝুলাইয়া রাখিবার কারণ কি?

কি জানি কারণ কি! তাহা লইয়া আমার আর মিছা মাথা ব্যথা করার দরকারও নাই,—বিবাহ যখন আমি করিবই না—। বাজারের পয়সা লইয়া গামছাখানি পকেটে পুরিতে পুরিতে তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম, বেলাও হইয়াছিল!

---

(১২)

দিন কাটিতেছে!

চার হাজারের পরিবর্ত্তে ছয় হাজার টাকা দিতে আপত্তি ছিল বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, নৈহাটির বাবুরা আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু এইখানেই বিবাহ বিপ্লবের সমাপ্তি হইল না। কলিকাতার অর্দ্ধেক লোকেই কি ঘটকালি করিয়া খায় নাকি? সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটির পর আর একটি, অনাহূত বা রবাহূত ঘটক ঘট্‌কী লাগিয়াই আছে! একি পরোপকার স্পৃহা! বাংলা দেশে কি পাত্রেরও দুর্ভিক্ষ হইল নাকি? আমার মত অপদার্থকে জামাই করিবার জন্যই বা লোকের এত কিসের প্রলোভন?

দেখিতেছিলাম, আমার বিশেষ আপত্তি থাকিলেও দাদার হাতে অর্দ্ধেক রাজত্ব তুলিয়া দিবার ও আমার স্কন্ধে পূর্ণাপূরি একটি রাজকন্যা চাপাইবার লোকের অভাব নাই। দিনগুলা বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

ও ধারে বোস্ সাহেবের বাড়ী, সেখানেও কি আজ কাল স্বস্তি ছিল আমার? কি জানি প্রথম দিনই হেম রায়কে আমি কি চোখে দেখিয়াছিলাম, এখন যখনই তাহাকে দেখি, বুকের ভিতর আমার যেন কেমন জ্বালা করিয়া উঠে।

মিস্ বোসের জন্মতিথির রাত্রে বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত ব্যথা লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। পরদিন একটু সকাল সকালই গিয়াছিলাম,

আশা করিয়াছিলাম আজ মিস্ বোসকে একান্তে পাইব। হল ঘরে ঢুকিতেই প্রথমে দৃষ্টি পড়িল কোণের সেই ছোট টেবিলটির উপর, আমার আনিত পূর্ব্ব দিনের সেই ফুলের বাস্কেটটি তেমনই কাগজে মোড়া পড়িয়া আছে! বেহারা ঘর পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে, কিন্তু কি জানি কেন সেটিকে সে ফেলিয়া দেয় নাই। কাছে গিয়া বাস্কেট্‌টি হাতে তুলিয়া লইলাম, কাল যে কত আশা করিয়াই এ'টিকে কিনিয়া আনিয়াছিলাম, দরিদ্রের কৃতজ্ঞ প্রাণের ভক্তি অঞ্জলি দিব! আবরণের মধ্যেই ফুল শুকাইয়া গিয়াছে, বাহিরে তাহার গন্ধ আসিতে পারিল না, অভীষ্টের নিকট অর্ঘ্য পৌঁছায় নাই। কাগজ খানি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেই শুষ্ক ফুলের পাপড়িগুলা ঝরিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, বিশীর্ণ বেলের গড়েটি আমার পায়ের উপরেই পড়িয়া গেল। অন্তরের কোন্ অন্তরতম প্রদেশ হইতে সবলে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

বেয়ারা খবর দিল, সাহেব ও মিসিবাবা রায় সাহেবদের ওখানে টি-পার্টিতে (চা-পানের নিমন্ত্রণে) গিয়াছেন। চারটা সাড়ে চারটার সময় বাহির হইয়াছেন, কখন ফিরিবেন ঠিক নাই, হয়ত এখনই ফিরিতে পারেন,—সাড়ে ছয়টা ত বাজে।

শূন্য ঘরে একা বসিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিলাম—মিস্ বোস্ আজই হেম রায়ের বাড়ীতে গিয়াছেন, গিয়াছেন তাহাতে আমার কি? তাঁহার, যাহার সহিত ইচ্ছা বন্ধুত্ব করিবেন, তাহাতে মনে মনেও প্রতিবাদ করিবার আমার কি অধিকার? কাল ওরূপে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যাওয়া বাস্তবিকই আমার উচিত ছিল না। অভিমান! আমার

আবার কিসের অভিমান? আমি ত ইহাদের মাহিনা করা চাকর মাত্র, দয়া করিয়া, আমার দুরবস্থায় অনুকম্পা দেখাইয়া মিস্ বোস কোনও দিন যদি আমাকে এতটুকু স্নেহ করিয়া থাকেন, সেই অধিকার লইয়া তাঁহার উপর অভিমান করিতে যাওয়ায় নিজেরই সঙ্কীর্ণতার পরিচয়।

কিন্তু তিনিও কি এতদিন কথায় ও কাজে অনেকখানি স্নেহেরই পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। বাঃ আব্দার ত আমার মন্দ নয়! তাই বলিয়া কি তিনি নিজের সমাজস্থ, সমকক্ষদের সহিত মিশিবেন না, না একদিন বিবাহ ও করিবেন না? মিস্ বোস বিবাহ করিবেন! হয়ত এই হেম রায়কেই—বুকের ভিতর ছ্যাঁক করিয়া উঠিল।

যা'ক্ এসব কেন? চাকর আমি, চাকরের মতই থাকিব। সত্যইত—বৌ'দি ঠিক কথাই বলেন, খৃষ্টানের সঙ্গে আমার এতটা মাখামাখি ত ভাল নয়। মাস গেলে মাহিনার সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ, মিস্ বোসের কার্য্য-করণের সমালোচনা করিবার জন্য ইহারা ত আমাকে মাহিনা দেন না, তবে মনে মনে অভিমান পুষিবায় আমার কি দরকার, অধিকারই বা কোথায়?

সাতটা বাজিল, অনর্থক আর বসিয়া থাকিয়া কি হইবে? কিন্তু আমি মাহিনা খাই, অন্ততঃ একঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যাওয়াও যে আমার উচিত।

সাড়ে সাতটার সময় বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইল, প্রথমে মিস্ বোস ও হেমরায়, পশ্চাতে মিষ্টার বোস প্রবেশ করিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়াই মিস্ বোস বলিলেন—এই যে বাবা, আপনার নরেন বাবু এসেছেন।

আমাকে শুনাইয়াই হেমরায় মিস্ বোসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—Who's that chap (লোক্‌টা কে) ?

মিস্ বোস কি বলিলেন শুনিতে পাইলাম না, দেখিলাম হেম রায়ের মুখে একটা তাচ্ছিল্য ভাব ফুটিয়া উঠিল।

বোস সাহেব বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—তাইত ঘোষ, কাল অমন নিঃসাড়ে চ'লে গেলে কেন ?—কন্যার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিলেন—ভারী লাজুক, কাল দেখি চুপ্‌টি ক'রে সিঁড়ির একধারে দাঁড়িয়ে আছে, ডাক্‌তে তবে ও আমার সঙ্গে ভেতরে যায়। পুরুষ ছেলে অত shy (লাজুক) কেন ? আজ কিন্তু তার শোধ দিয়ে যেতে হবে নরেন, আজ আর পালাতে পাচ্ছ না। রায়ও এখান থেকে খেয়ে যাবে, কেমন ?

স্মিতহাস্যে মিস্ বোস্ বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ বাবা, মিষ্টার রায়কে তা'হলে বেশ জব্দ করা হবে—চা'য়ের নেমন্তন ক'রে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বেলা পাঁচটার সময়ে এক রাশ্ গিলিয়ে দেওয়ার ফলটা টের পাবেন।

—আঃ খেয়ে যেতে হবে এইত কথা ? তা'তে কি ডরাই আমি ? Gladly, gladly, (সানন্দে, সানন্দে)।

—আচ্ছা পেটুক দামু ত তা'হলে আপনি, খাওয়ার নামেই জিভ্ দিয়ে জল পড়ে ?

বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্ত মিস্ বোস ভিতরে গেলেন। বোস সাহেব বলিলেন—রায়, তোমার সঙ্গে বুঝি নরেনের এখনও পরিচয় হয়নি ?—নরেন—নরেন্দ্রনাথ ঘোষ এঁর নাম, সিটি কলেজে বি এ থার্ড ইয়ার ক্লাসে পড়েন। সন্ধ্যার সময়টা একা একা ভাল লাগে না, ওঁর সঙ্গে একটু আধটু পড়া শোনা করা যায়।

আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—ইনি হচ্ছেন, আমার সহ-ব্যবসায়ী স্যামুয়েল পীতাম্বর রায়ের পুত্র, স্যামুয়েল হেমেন্দ্র রায়, আই, সি, এস্ পরীক্ষার জন্য বি, এ পড়্তে পড়্তেই ইনি এখান থেকে বিলেত চলে যান। বছর তিনেক—(তিন বছরই হবে, কেমন রায় ?) হাঁ, তিন বছর সেখানে ছিলেন। শরীর খারাপ হ'তে লাগল,—পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না, এই সবে পাঁচ ছ'দিন আগেই ইনি বোম্বায়ে Land করেছেন (জাহাজ থেকে নেমেছেন)।

ভদ্রতা বাঁচাইয়া মিষ্টার রায়কে নমস্কার করিলাম, সে একবার একটু ঘাড় বাঁকাইল মাত্র। আলাপ করিবার জন্য কোন পক্ষই আগ্রহ দেখাইল না। সুতরাং যেমন বসিয়াছিলাম, চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলাম।

মিস্ বোস্ ফিরিয়া আসিলেন। সাড়ে আট্টা বাজিল, খাবারের আয়োজন হইতে লাগিল। উঠিয়া বোস্ সাহেবকে বলিলাম—আজও ত কাজ কিছুই হ'ল না, সাড়ে আট্টা বেজে গেছে, আমি তা'হলে এখন যেতে পারি ?

বোস্ সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন—সে কি, যাবে কি ? খে'য়ে দে'য়ে যাবে তখন।

—আজ্ঞে শরীরটা আজ ভাল নেই, রাত্রে কিছু খাব না, মাপ কর্ব্বেন্।

—শরীর ভাল না! কেন, কি হয়েছে ? সত্যইত তোমাকে আজ কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে,—কোনও অসুখ বিসুখ, জ্বর টর ত হয়নি ?

—আজ্ঞে না, সে সব কিছু না, তবে শরীরটা তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না।

—ওঃ তা আজ না এলেই পার্ত্তে। যাক্, তা হলে সকাল সকালই বাড়ী যাও, রাত ক'রে কাজ নেই। আজও খেলে না,—শরীর খারাপ, এর ওপর আর কথা কি?

মিস্ বোস হাঁ, না কোন কথাই বলিলেন না, একবার চাহিয়া দেখিলেন সত্যই আমি বাহির হইয়া যাইতেছি কি না।

পূজার কয়দিন বাহির হই নাই। চার দিন পরে আসিয়া দেখিলাম, আজও হেম রায়ের আগমন হইয়াছে। পড়া শুনা কিছুই হইল না। দু' ঘণ্টা রহিলাম, মিস্ বোস একটি কথাও বলিলেন না। আজও মিষ্টার বোস্ খাইবার কথা বলিলেন। আমি ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই মিস্ বোস বলিলেন—রোজ মিছে অনুরোধ করা কেন বাবা, আমাদের এখানে আর খাবেন না যখন উনি।

বুঝিলাম না, আমাকে শীঘ্র বিদায় করিবার জন্য অথবা অভিমান বশে তিনি এরূপ কথাটা বলিলেন। চাহিয়া দেখিলাম তিনি অন্যদিকে ফিরিয়া আছেন।

বোস সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, কিন্তু আমার মুখে কোনও উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া আবার কন্যার দিকে ফিরিলেন।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, মিস্ বোস কি উত্তর করিলেন কানে গেল না; বাহির হইয়া আসিলাম।

এই ভাবেই দিন কাটিতেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আসিয়াছি, অনেক দেরী করিয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু যখনই আসি আর যতক্ষণ

অপেক্ষা করি না কেন, হয় ত কোনও দিন শুনি মিস্ বোস মিষ্টার রায়ের সহিত বেড়াইতে গিয়াছেন, নয় ত দেখি হেম রায় তাঁহার সব সময়টুকু অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

---

(১৩)

অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি বোস সাহেবের শরীর আবার খারাপ হইল। বৃদ্ধ বয়সে রক্ত-আমাশায়ে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। এই সবে কিছুদিন পূর্ব্বে বাতে পড়িয়া একমাস দেড়মাস ভুগিয়াছিলেন, ভাল করিয়া সারিয়া উঠিতে না উঠিতেই আবার আর এক রোগে আক্রমণ করিল। এবার তিনিও যেন কেমন মুস্‌ড়াইয়া গেলেন। প্রতি সন্ধ্যায় আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহাকে অন্য-মনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যেদিন তিনি একটু ভাল থাকি-তেন, কতক্ষণ কাগজ পড়িয়া বা আর কিছু পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তার পর সময় হইলে উঠিয়া বাড়ী ফিরিতাম। কোনও দিন বা এই ঘরে মিস্ বোসের সহিত দেখা হইত কোনও দিন বা হইত না। স্পষ্টই দেখিতেছিলাম, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই আমাকে এড়াইয়া চলিতে-ছিলেন। আমারই বা এত খোসামোদ কিসের, নাইবা তিনি আলাপ করিলেন? যেদিন দেখা হয়, বিশেষ বাক্য বিনিময়ও হয় না, পিতার সমক্ষে ভদ্রতা বজায় রাখিতে হয়, দুই একটি এ কথা ও কথা কালে ভদ্রে বলেন। দেখিতে পাই তাঁহার মুখখানি কেমন ভার ভার, আমাকে দেখিলেই যেন অন্ধকার হইয়া যায়। কেন, আমি তাঁর কি করিয়াছি, বরং তিনিই ত—,আমার উপর তাঁর এ রাগের কারণ কি?

বোস্ সাহেবের অসুখ দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। একদিন আসিয়া শুনিলাম, ডাক্তার বাবু তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। শীঘ্রই কোথাও যাইবার উদ্যোগ হইতেছে।

কন্যার এবার পরীক্ষার বৎসর, সম্মুখে শীতকাল, এমন সময়

কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় কোন্ বিদেশে যাইতে হইবে—বোস্ সাহেব প্রথমে না যাইবার ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষটা যাওয়াই ঠিক হইল। একদিন তিনি কথায় কথায় আমাকে বলিলেন—নরেন, তুমিও যদি আমাদের সঙ্গে যেতে পার্ত্তে! নীলির ত এবার আর পরীক্ষা দেওয়া হ'য়ে উঠ্‌বে না দেখ্‌ছি। তোমারও বা পড়ার ক্ষতি কর্ব্ব কেন, নইলে তুমি আমাদের সঙ্গী হ'লে ভালই হ'ত, আমার কোন ভাবনাই থাকত না। দেখি, রায় ত বল্‌ছে, আমাদের সঙ্গে যাবে, সেখানে পৌছিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আস্‌বে।

কয়দিন হইতে একটা কথা বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু ইঁহারা যখন শীঘ্রই চলিয়া যাইতেছেন তখন আর উপযাচক হইয়া আমার না বলাই ভাল। এবার দ্বিগুণ উৎসাহেই অন্যত্র একটা কাজের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

একদিন আসিয়া শুনিলাম আর চার দিন পরে, রবিবারে সন্ধ্যার মেলে ইঁহারা রওনা হইবেন, প্রথমে হাজারিবাগে উঠিবেন বাড়ী ঠিক হইয়াছে, সেখানে সুবিধা না হইলে পরে অন্যত্রও যাইতে পারেন।

বোস সাহেবের কাম্‌রা হইতে বাহির হইয়া হল ঘরের মাঝামাঝি আসিয়াছি—

—নরেন্!

পশ্চাৎ হইতে মিস্ বোস ডাকিলেন। ফিরিয়া দেখিলাম মিস্ বোস লাইব্রেরী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, ঘরের ভিতর হেমরায় চেয়ার হইতে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় বিস্ময় বিমূঢ়ের ন্যায় এদিকে চাহিয়া আছে।

আজ যে প্রায় দেড় মাস মিস্ বোসের মুখে আমার নাম শুনি নাই! কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন—বাড়ী যাচ্ছিলে? একটু দেরী কর, কাজ আছে একটা। আজ খে'য়ে যেও।

তুচ্ছ খাওয়ার কথা! এতদিন পরে তাঁহার মুখের ডাক শুনিয়াই শরীরের মধ্যে একটা প্রবাহ উঠিয়াছিল। কিন্তু, খাইয়া যাইতে হইবে আজ, মাত্র এই কথা! ছু'দিন পরে চলিয়া যাইবেন, আর কখনও দেখা হইবার সম্ভাবনা রহিবে না, তাই কি এ লৌকিকতা, কিছু দরকার নাই, নিত্যকার মত আজও আমার খাওয়া বাড়ী গিয়াই হইবে, হেমরায় ত এখানে আছে! অসম্মতি জানাইতে যাইতেছিলাম, মিস্‌বোসের স্থির গম্ভীর মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই কিন্তু আর তাঁহার এ আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপত্তিই আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না, নিরুত্তরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। লাইব্রেরী ঘরের দিকে ফিরিয়া মিস্ বোস বলিলেন—Mr. Roy, you will please excuse me for a minute (মিষ্টার রায়, 'এখুনি আস্‌ছি' আমি, এক মিনিটের জন্যে আমাকে মাপ কর্ব্বেন)।

অন্য দ্বার দিয়া মিস্ বোস ভিতরে চলিয়া গেলেন।

হেমরায়ের নিকট এক মিনিটের ছুটী চাহিয়া তিনি ভিতরে ঢুকিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ মিনিট হইল, দশ মিনিট কাটিয়া গেল, তাঁহার দেখা নাই, ওঘরে হেমরায় অস্থিরভাবে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে, আর এক একবার কট্‌মট্ করিয়া আমার দিকে চাহিতেছেস।

আরও কয়েক মিনিট পরে মিস্ বোস বড় একখানি ডিসে করিয়া খাবার সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, খানসামা জলের গ্লাস লইয়া পিছু

পিছু আসিল। টেবিলের উপর ডিস্‌খানি রাখিয়া বলিলেন—তুমি বস আমাদের এখনও একটু দেরী আছে।

এতক্ষণ অবসর পাইয়া পূর্ব্ব অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছিল, বলিলাম—আজ আবার এ সব কেন?

স্থির দৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি উত্তর করিলেন—

ত্ব এক দিন পরেই আমরা চলে যাচ্ছি—

—ওঃ তাই—তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কি উত্তর করিতেছিলাম এমন সময় হেম রায় ঘরে ঢুকিয়া বলিল—One minute, isn't it (এক মিনিট, কেমন)? তাহার স্বর শ্লেষপূর্ণ।

মিস্ বলিলেন—I beg your pardon (মাপ কর্ব্বেন আমাকে)

ইহার উপর আর কথা চলে না। রায়ের মনে মনে বোধ হয় খুবই রাগ হইয়াছিল, তবুও হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল—আমাকেও ত কাল নেমন্তন্ন ক'রে রেখেছেন, ভুলে গেলেন নাকি?

—না, খান্‌সামা ত এখনই আমাদের খাবার নিয়ে আস্‌ছে। আচ্ছা তুমি না হয় ঐ ছোট টেবিলটাতেই বস্‌বে চল, নরেন।

রায় বিস্মিত অপ্রস্তুত ভাবে একবার আমার মুখের দিকে একবার মিস্ বোসের মুখের দিকে তাকাইল। এতক্ষণ আমি খাবারে হাতও দিই নাই। মিস্ বোস আবার নিজে থালখানি উঠাইয়া লইয়া ছোট টেবিলে রাখিলেন, আমাকে বলিলেন—তুমি আর দেরী করো না, ট্রাম পাবে না তা'হলে!

হঠাৎ আজ আবার এত খাতির কেন? হেম রায়ও নিশ্চয় মনে

মনে খুবই আশ্চর্য্য ও ঈর্ষান্বিত হইতেছিল। মিস্ বোস্ আমার পাশেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতদিন ত তাঁহার সাম্‌নে তাঁহারই সহিত একত্রে খাইয়াছি, আজ কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল, সেই প্রথম দিন আমার এখানে আগমন ও আহারের কথা মনে পড়িল। থালায় হাত দিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। হেম রায় ঘুরিয়া আসিয়া আমার চেয়ারের কাছে দাঁড়াইল, হাসিবার চেষ্টা করিয়া ইংরাজীতে বলিল—আমার কিন্তু হিংসা হচ্ছে।

কথাটা সে বিদ্রুপের ভাবে বলিতে গেলেও, আপনা হইতেই যেন একটা ঈর্ষার ভাব প্রকাশ পাইল। আমিও একটা খোঁচা দিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না, বলিয়া ফেলিলাম—I'm merly a servant, sir, (আমি মশায় সামান্য চাকর)।

—আঃ—

যুগপৎ রায় ও আমি স্তম্ভিত হইয়া মিস্ বোসের দিকে চাহিলাম, শব্দটা তিনি এমনই একটা অস্বাভাবিক স্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। রায় কি বুঝিল সেই জানে, কোনও কথা না বলিয়া সে নীরবে ওধারে বড় টেবিলের পাশে গিয়া বসিল।

খান্‌সামা বড় টেবিলে খাবার সাজাইতেছিল। একবার একটু কাসিয়া মিস্ বোস্ বলিলেন—আর কিছু কি তোমার দরকার হবে নরেন্? এ'নে দিয়ে আমরাও তাহলে বসে যাই—ন'টা বাজে।

—না, আমার আর কিছু চাই না, এই-ই যথেষ্ট।

এক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর করিলেন —বেশ।

বড় টেবিলের পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া মিস্ বোস বসিয়া বলিলেন—নিন্ মিষ্টার রায়, এবার আরম্ভ করুন।

রায়, মুখ গোঁজ করিয়া খাইতে লাগিল। মিস্ বোস এ'টা ও'টা নাড়া চাড়াই করিতে লাগিলেন, কেমন অন্যমনস্ক ভাব।

গ্লাসের জলেই মুখ হাত ধুইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মিস্ বোস বলিলেন—ও'কি সবইত প'ড়ে রইল, খেলে না?

—খেয়েছিত, আর কত খাব!

মিস্ বোস্ বলিলেন—ও ঘরে ড্রয়ারের মধ্যে একখানা বইয়ের ফর্দ্দ ও টাকা আছে, নিয়ে যেও, কাল আস্‌বার সময় বইগুলো কিনে এনো। চাবি টেবিলের উপরেই আছে বোধ হয়, দেখ দেখি।

টেবিলের উপরেই চাবি ছিল, দেরাজ খুলিয়া দেখিলাম, সম্মুখেই একটা পেপার-ওয়েট্ চাপা খানকয়েক নোট ও একখানা স্লীপ কাগজ। সে গুলি উঠাইয়া লইয়া ফিরিয়া আসিতে মিস্ বোস বলিলেন —দেখি, হাঁ ঐ'টাই। কাল তা'হলে বই গুলো নিয়ে এস'।

বাহিরে আসিয়া পথে গ্যাসের আলোতে কাগজ খানি খুলিয়া দেখিলাম—সেখানি বি এ ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকের একখানি তালিকা উপরন্তু কয়েক খানি নামজাদা ভাল ভাল পুস্তকের নামও তাহাতে দেওয়া হইয়াছে। এ সব বই ত মিস্ রায়ের আছেই, তবে আবার কেনা কেন? কেন, কি জানি, আমার সে খোঁজে দরকারই বা কি? কিন্তু এতদিন পরে মিস্ বোসের আজিকার আচারণটা—

(১৪)

—শরীরটা বাস্তবিকই এবার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। বয়স হয়েছে, এখন আর রোগের সঙ্গে যুঝ্‌বার তেমন ক্ষমতাও নেই। বিদেশে ত যাচ্ছি, কিন্তু সারতে পারব' কি? ইচ্ছা ছিল না, এই শরীর নি'য়ে মেয়েটাকে সঙ্গে ক'রে কোথাও যাই, আশ্চর্য্য ত কিছুই নয়, বিদেশে যদিই একটা কিছু হয়, কেউ থাক্‌বে না মেয়েটাকে ধ'রে তোলে। যাক্‌ ভগবানের ইচ্ছা! দিন কুড়ি পরে তোমার ত বড়-দিনের ছুটী হবে, সে সময় যদি পার একবার চেষ্টা ক'রো দিন কতকের জন্যেও যদি তুমি আমার কাছে যেতে পার, বড় খুসী হব আমি, নীলিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌বে। হাঁ, বল্‌ছিলুম কি, রঘুসিংএর কাছে রসিদের বই টই গুলো রইল', সে-ই বৌ' বাজারের বাড়ী ভাড়াটা আদায় কর্ব্বে। তা থেকে তার নিজের মাইনে, এখানকার আর আর খরচপত্র চালাবে। আর তা'কে বলে দিয়েছি, তোমার পঁচিশ টাকা তার কাছে যখন হ'ক চাইলেই পাবে। কবে কোথায় থাক্‌ব' তার ত কিছুই স্থিরতা নেই, টাকা পেতে তোমার দেরী হ'লে অসুবিধা হতে পারে। এক একবার সময় মত তুমি এদিকে এলে বাড়ীটারও খোঁজ খবর নেওয়া হবে। হাজারিবাগের ঠিক্‌নাটা নীলির কাছে জেনে নিও। তোমার যখন যা দরকার হবে আমাকে জানাতে যেন লজ্জা করো না নরেন। আমার

ছেলে নেই, কি জানি কেন প্রথম থেকেই তোমার ওপর আমার কেমন একটা মায়া ব'সে গেছে।

শনিবার রাত্রে বোস সাহেব আমাকে বলিতেছিলেন।

কালই ইঁহারা চলিয়া যাইবেন,—মনকে এতক্ষণ চোক রাঙাইতেছিলাম, তোর কি? কিন্তু বোস সাহেবের কথা শুনিতে শুনিতে এবার মনই চোখ্‌কে রাঙাইয়া তুলিতেছিল! কোথার কে আমি, কয়েক মাস পূর্ব্বে পথ হইতে তিনি আমাকে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন, নাম মাত্র একটা কাজের উপলক্ষ্য করিয়া এতদিন এমন উদারভাবে আমাকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ নিজে পীড়িত হইয়া বিদেশে যাইতেছেন, তবু এখনও আমার কথা ভাবিবার আমার জন্য বন্দোবস্ত করিবার তাঁহার বিরাম নাই। মানুষের মন এত উচ্চও হয়? তবুও তিনি আমার কেহ নহেন, কোন সম্বন্ধের সম্ভাবনাও নাই। আর আমার মা'য়ের পেটের ভাই—

এতদিন ধরিয়া ইঁহাদের বিরুদ্ধে মনের ভিতর অকারণ যে অভিমান জমা করিয়া রাখিয়াছিলাম মুহূর্ত্তে সেটা গলিয়া গিয়া চোখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল। গদগদ কণ্ঠে বলিলাম—জন্মিয়াই পিতৃহারা হয়েছিলুম, বাপের স্নেহ কখনও জানি নি, আজ আপনার কাছে তার আস্বাদ পেয়েছি। সঙ্কীর্ণতায় অন্ধ হ'য়ে আপনার এ উদার হৃদয় এত দিনেও চিন্‌তে পারি নি, ক্ষমা করুন আমাকে। আপনাদের এই যাবার কথা উঠ্‌বার আগে ক'দিন থেকে মনে করেছিলুম, 'আপনাদের সংশ্রব ত্যাগ করব'।—ভেবেছিলুম, আমার দুরবস্থা দে'খে একদিন দয়া করেই আপনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন, সেই সুযোগে বুঝি আমি

আপনাকে ফাঁকি দিচ্ছি—আপনিও চক্ষু লজ্জায় আমাকে বিদায় দিতে পার্চ্ছেন না। ক্ষমা করুন—বড় ভুল বুঝেছিলুম আমি। নইলে আপনি পীড়িত হ'য়ে বিদেশে যাচ্ছেন, এখনও আমার অবস্থা ভেবে আমার একটা উপায় ক'রে দিয়ে যাবার জন্য আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন।

—আমার কথা ভেবে আপনি ব্যস্ত হবেন না, ভগবান করুন আপনি শীঘ্রই আরাম হ'য়ে ফিরে আসুন। আমার যখনই যা' দরকার হবে নিঃসঙ্কোচে আপনার কাছে চেয়ে নেব। এখন আর আমাকে টাকা নিতে আদেশ কর্বেন না। এমন ক'রে আমি আপনার এ স্নেহের অপব্যবহার কর্ত্তে পার্ব্ব না। অকারণ পিতার ভার বৃদ্ধি করা সক্ষম পুত্রের উচিত নয়।

—পাগল, একেবারেই পাগল আর কি! পয়সা ত যথেষ্টই রোজগার করেছিলুম, ভোগ করবার লোক হ'ল না। তা ছাড়া দারিদ্র কষ্ট যে কি জিনিষ নিজে না সেটা ভাল রকমই বুঝেছিলুম, তাই সাধ্য মত লোকের সে কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করেছি, ক্ষুদ্র শক্তিতে কতটুকু সমর্থ হয়েছি ভগবানই জানেন। কিন্তু তোমার বিষয় স্বতন্ত্র কথা, প্রথমকার কথা ছেড়ে দাও, পরে কিন্তু তোমাকে আমি শুধু সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই নিস্বার্থভাবে কাছে রাখিনি। দিন দিন তোমার স্বভাবে মুগ্ধ হ'য়ে ভেবেছি, আমার নিজের একটা ছেলে থাকলে, সেও হয়ত এমনই হ'ত। পাগল! বলে কিনা আমার স্নেহের অপব্যবহার কর্ব্বে না! আরে, বাপের স্নেহ, সে'ত শুধু সন্তানের জন্যই, তার আবার অপব্যবহার কিরে! ও সব ছেলে বুদ্ধি ছেড়ে দাও নরেন্ নিজের পড়া শুনার ক্ষতি করো না। হ্যাঁ বড়দিনের ছুটীতে কিন্তু তোমার আসা

চাই-ই। ক'মাস রোজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে ক'রে বুড় বয়সে সেটা যেন একটা নেশা হয়েই দাঁড়িয়েছে,—তোমার অভাবটা নরেন্, বড়ই অনুভব কর্ত্তে হবে আমাকে।

আমি না ভাবিয়াছিলাম ইঁহাদের দয়ার দান পঁচিশ্‌টি টাকার সহিতই আমার সম্বন্ধ? একি কিন্তু স্নেহের বাঁধনে বৃদ্ধ আমাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! বলিলাম—কি ব'লে আপনাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব'!—

—পাগল, আবার ঐ সব কথা? এই না তোমাকে স্পষ্টই বল্‌লুম—আমি স্বার্থশূন্য হ'য়ে তোমাকে স্নেহের চোখে দেখি না। যাক্, সব সময় চিঠি পত্তর দিও, পড়া শুনার কথা আমাকে জানিও। তোমার খবর না পেলে আমার ভাব্‌না হবে কিন্তু।

—কিসের ভাব্‌না হবে বাবা? বলিতে বলিতে মিস্ বোস ঘরে ঢুকিলেন।

—এই যে মা! হেম কি আজ এখনি চলে গেল নাকি?

—সন্ধ্যার পরেই ত তিনি চলে গেছেন। কিসের ভাবনা হবে বল্‌ছিলেন বাবা?

—নরেনকে বল্‌ছিলুম। বল্‌ছিলুম যে, বুড়োর ঘরে সে এই শেষ রাতে ডাকাতি করেছে, জোর ক'রে অনেকখানি স্নেহই সে ছিনিয়ে নিয়েছে। বিদেশে গিয়ে তার খবর না পেলে বড়ই ভাব্‌না হবে।

—ওঃ, আপনার ওষুধ খাওয়া হয়নি এখনও?

—মিনিটে মিনিটে ওষধ খাই'য়ে কি বাপের রোগ সারাতে চাস্

নাকি মা? এইত সাড়ে সাতটার সময় নরেনের হাত থেকে নিয়ে এক দাগ খেয়েছি।

—কালকার সব গোছ্‌গাছ নিয়ে ভুলে গিয়েছিলুম, খেয়ালই ছিল না কখন সাড়ে সাতটা বেজেছে। যাক্ তাহ'লে ঠিক সময়েই খাওয়া হয়েছে।

এতক্ষণ পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—আট্‌টা এখনও বাজে নি, তুমি একবার পড়্‌বার ঘরে এস ত নরেন, আল্‌মারীর বইগুলো গুছিয়ে রাখ্‌তে আমাকে একটু সাহায্য কর্‌বে।

—হ্যাঁ এই আর এক পাগল! নিজেরা কষ্ট ক'রে ধূলো ঘাঁট্‌বার কি দরকার, বেয়রাকে বল্‌লেই ত পার্ত্তে মা।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—তা যাও, ভাই ব'নে এখন বই নিয়ে ব্যস্ত হও, আর বুড়ো এখানে একা চুপ্‌টি ক'রে বসে থাক্।

আমি মিস্ বোসের দিকে চাহিলাম, বলিলাম—আপনি না হয় এখানে একটু বসুন, কি কর্ত্তে হবে বলে দিন্ আমি একাই পার্ব্বো।

মিষ্টার বোস হাসিয়া বলিলেন—না, না, আমি এবার একটু ঘুমুতে চেষ্টা করি। তুই-ই পাগল, বুড়োর কথায় অভিমান কি! হাঁ, কাল ষ্টেসনে আস্‌ছ' ত নরেন?

—আজ্ঞা হাঁ, কাল তিন্‌টার সময়ে এখানেই আস্‌ব'।

বোস সাহেব একটা তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিয়া হাত বাড়াইতেই ব্যস্তভাবে পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—পাগল না খ্যাপা! আমি যে খৃষ্টান—ওরে নীলি আজ নরেন্‌কে না খাইয়ে যেন ছেড়ে দিস্‌নে।

মিস্ বোস বিস্মিতভাবে চাহিয়াছিলেন বলিলেন—আচ্ছা।

তাঁহার দিকে চাহিতেই আমার কেমন লজ্জা হইল, তাইত, আজ যে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম—ইঁহারা খৃষ্টান, আমি হিন্দু।

মিস্ বোস আগে আগে ঘর হইতে বাহির হইলেন।

---

(১৮)

লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, টেবিলের উপর স্তূপাকারে বই সাজান। মিস্ বোস বলিলেন—ছোট আল্‌মারির নীচের কাচখানা ভেঙ্গে গেছে, বইগুলো পোকায় কাটবে। আমি তুলে তুলে দিচ্ছি, তুমি বইগুলো মাঝের ঐ আল্‌মারিটায় সাজিয়ে রাখ’।

বই গুছাইয়া রাখা হইল। একটা ঝাড়নে হাত মুছিতে মুছিতে মিস্ বোস বলিলেন—র‍্যাকের ও বইগুলো তুমি যাবার সময়ে নিয়ে যেও, সহিস্‌কে ব’লে দিয়েছি গাড়ীতেই যেও।

—ও ত সব আপনার কলেজের পড়্‌বার বই, আমি নিয়ে যাব’ কেন?

—তা হ’ক, ও’তে অনেক নোট্ লেখা আছে, মার্ক করাও আছে অনেক জায়গায়, তোমার স্থবিধে হবে। আমি ত এবার পরীক্ষা দিচ্ছি না, তা ছাড়া আর এক সেট্ বই ত সেদিন তোমাকে দিয়েই আনিয়েছি। ওগুলো তুমি নিয়ে যেও।

চুপ করিয়া রহিলাম, এই একটু পূর্ব্বেই বোস সাহেবের স্নেহের স্রোতে পড়িয়া আমার সব অভিমান, সকল গর্ব্বই ভাসিয়া গিয়াছে। মিস্ বোসকে বলিতে পারিলাম না,—না আপনার এ অনুগ্রহে আমার দরকার নাই।

মিস্ বোসও নীরবে সম্মুখের বইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। বোধ হইল তাঁহার মুখখানি যেন কেমন অন্ধকার ও বিষণ্ণ। তবে কি তিনি আজও আমার প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্টই রহিয়াছেন? মিস্ বোসের জন্মতিথির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিলে তিলে হেম রায়ের প্রতি আপনা হইতেই হৃদয়ে যে একটা ঈর্ষাভাব জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত আমার নিজের মনের অগোচর ছিল না। এই ঈর্ষাকেই কেন্দ্র করিয়া মিস্ বোসের উপরে অভিমান দেখাইতে গিয়া আমিও যে এতদিন তাঁহার প্রতি সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব্যবহার করি নাই। আজ বোস সাহেবের কথায় নিজের বিচার শক্তির উপরে একটা অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তবে কি মিস্ বোস গোড়াতেই আমার মনের পাপ বুঝিয়াই এতদিন আমার উপর রাগ করিয়া আমাকে এরূপ দূরে দূরে রাখিয়া চলিতেছিলেন? হায় ঈর্ষান্ধ অভিমানী অন্তর! অনুতপ্ত-কণ্ঠে বলিলাম—

—কাল ত আপনারা চ'লে যাবেন মিস্ বোস, আমাকে মাপ ক'রে যান্।

যেন একটু বিস্মিত ভাবেই বলিলেন—আমি মাপ্ কর্ব্ব? কেন, তোমার কি অপরাধ?

—কি অপরাধ আমার আপনি কি জানেন না?—তবে এই এক মাস দেড় মাস কেন আপনি আমাকে এমন ক'রে দূরে দূরে রেখেছেন? একটিবার ভাল করে কথাও বলেন নি—কেন? আগে কি আপনি এম্নি ব্যবহারই কর্ত্তেন? সেদিন, আপনার জন্ম-তারিখে আপনাকে দেব' বলে গোটাকতক ফুল এনেছিলুম, গরীবের কৃতজ্ঞ প্রাণের সে

সামান্য উপহার আপনি নিলেন না—দেবার আমায় অবসরই দিলেন না, ফুলগুলো শুকিয়েই গেল। হেম রায়কে পে'য়ে, তার বন্ধুত্ব লাভ করে' অবধি আপনি কই এক দিনও ত ফিরেও তাকান্ না যে আমারও প্রাণে ব্যথা বোধ করবার শক্তি আছে! এক দিন আপনিই ত নিজে আমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন,—আপ্নাকে নিজের বলে ভাব্তে—স্নেহ-ময়ী ভগিনী মনে কর্ত্তে আমাকে শিখিয়েছিলেন, কথায় কাজে আমাকে বুঝিয়েছিলেন—আপনি নিজেও আমাকে পর ভাবেন না। নইলে আমার কি আস্পর্দ্ধা ছিল—সামান্য চাকর আমি—আপনার কাছে স্নেহের দাবী কর্ত্তে যাই? তখন কি বুঝেছিলুম আপনার এ স্নেহ এত শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে, তা হ'লে কি নিস্ফল অভিমান ক'রে অপরাধের বোঝা বাড়াতুম, না আপনার এতটা বিরাগভাজন হতুম্?

দেখিবার কি ভুল হইয়াছিল? মনে হইল মিস্ বোসের মুখে একটা ব্যথা জাগিয়া উঠিতেছে, যেন আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—নরেন্!

নাড়া চাড়া করিতে করিতে একখানি বই নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া মিস্ বোস সেখানি তুলিবার জন্য টেবিলের নীচে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

বুঝিলাম কি বলিতে গিয়াই হঠাৎ সাম্লাইয়া লইয়া তিনি আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আজ যেন আমার কিসের নেশা চাপিয়া গিয়াছিল, আবার বলিতে লাগিলাম—অপরাধ না কর্লে কি অকারণেই আপনার এমন পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল? নিজের মনেও ত বুঝ্ছি অপরাধ যথেষ্টই করেছি, স্বার্থপূর্ণ প্রাণে ঈর্ষারবশে আপনার স্নেহে সন্দেহ ক'রেছি, মিষ্টার রায় হঠাৎ কোথা থেকে এ'সে আমাকে

আপনার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে মনে করে তার ওপর রাগ করেছি, শেষটা অভিমানে অন্ধ হ'য়ে আপনাদের সংশ্রব একেবারেই ত্যাগ কর্‌বার সঙ্কল্প করেছি। আমি কি এখন বুঝ্‌ছি না, কি অপরাধ আমার, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না, না আপনিও আমার অপরাধ বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না! বলুন আপনি এবারকার মত আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন? আর কখনও আমি এমন মিছে অভিমান করে আপনাকে বিরক্ত কর্‌ব'না। মুখ ফিরিয়ে নিলে চল্‌বে না, কালই ত আর ক্ষমা চাইবার আমার অবসর থাক্‌বে না, বলুন আমায় আপনি মাপ কর্চ্ছেন—আমার অপরাধ ভুলে যাবেন, ছোট ভাই ব'লে আমার—

বইখানি কুড়াইয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিতে গিয়া তাঁহার হাতখানি বইয়ের উপরেই নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। বলিবার উত্তেজনায় হঠাৎ দুই হাতে তাঁহার সে হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া টেবিলের উপর নত হইয়া পড়িলাম,—মিস্ বোস, বলুন আবার আমাকে তেমনি স্নেহ কর্‌বেন! কাল যে আপনি চলে যাবেন, আবার কবে দেখা হবে না হবে—

হাতের ভিতর তাঁহার হাতখানি যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল, আর কোনও সাড়া পাইলাম না। আবার ব্যাকুল ভাবে বলিলাম—কারও স্নেহ পাইনি, কাকেও যে ভালবাস্‌তে শিখিনি আমি, আপনাদের আশ্রয়ে এ'সে, আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে আমার সে অভাব ঘুচেছিল। আপনিও কি আজ বিরূপ হলেন?

তবুও কোন উত্তরই পাইলাম না, মাথা তুলিয়া দেখিলাম মিস্ বোস অপর হাতখানি দিয়া চেয়ারের হাতলটি সবলে আঁকড়াইয়া

বসিয়া আছেন, মাথাটা আরও একটু বুকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে চোখ চাহিয়া আছেন কি না বুঝিলাম না, নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল কি না জানি না! কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়াও এ আড়ষ্ট ভাবের অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে কি আমার কথায় আরও অসন্তুষ্ট হইলেন!

আপনা হইতেই বুকের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, বলিলাম—সত্যই তা'হলে আমাকে আর ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্বেন না আপনি?

সহসা নিদ্রাভঙ্গে লোক যেমন ধুড়্‌মুড়্‌ করিয়া সজাগ হইয়া উঠে, তেমনই চকিতভাবে সোজা হইয়া বসিয়া, আমার শিথিল হাতের ভিতর হইতে নিজের হাতখানি টানিয়া লইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—ক্ষমা, তোমাকে? নিজেকেই যদি ক্ষমা কর্ত্তে পাতু্র্ম আমি '

একটু থামিয়া নিশ্বাস লইয়া আবার বলিলেন—বেশ্‌ তোমার যদি সেই ধারণাই হ'য়ে থাকে, তা'হলে না হয় ক্ষমাই কর্চ্ছি আমি। কিন্তু যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ কর্ত্তে পার্ত্তে কি পাপ আমার . এই—ওঃ! বাব বুঝি ডাক্‌ছেন, যাই।

অস্থির পদে টলিতে টলিতে মিস্‌ বোস্‌ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মিস্‌ বোস কি বলিলেন, কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন, কেনই বা হঠাৎ অমন করিয়া পলাইয়া গেলেন? আমার হৃদয়ও কেন আজ সহসা এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল? মিস্‌ বোস ত আমাকে ক্ষমা করিরা-ছেন। তবুও প্রাণে এমন কি একটা অতৃপ্তি, অজ্ঞাত ব্যথা রহিয়

গিয়াছে,—কেন এ অতৃপ্তি ? কিসের ব্যথা এ'টা ? যেন বুঝিতেছি অথচ বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিবার চেষ্টাও নাই—ভয় !

কতক্ষণ একা বসিয়া রহিলাম খেয়াল ছিলনা, মিস্ বোস কতক্ষণ ঘর ছাড়িয়া গিয়াছেন, মনে নাই। হঠাৎ সসজ্ঞা হইয়া শুনিলাম মিস্ বোস্ হল ঘর হইতে ডাকিতেছেন—নরেন খাবে এস।

উঠিয়া আসিয়া খাইতে বসিলাম, মিস্ বোস নিজেও আর কিছু বলেন না, কথা বলিতে আমারও কেমন ভয় ও লজ্জা হইতেছিল, কেন কি জানি। বার বার ইচ্ছা হইতে লাগিল মিস্ বোসের মুখ খানিতে একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখি তখনকার তাঁহার অসমাপ্ত কথাটা যদি সেখানে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে। কিন্তু চেষ্টা করিয়াও মুখ তুলিতে পারিলাম না। কেন ?

আহার শেষ করিয়া উঠিতে দশটা বাজিল। গাড়ী তৈয়ার করিয়া আনিবার জন্য মিস্ বোস খান্সামাকে আস্তাবলে পাঠাইলেন। নিজে গিয়া পড়ার ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কখন গাড়ী আসে। আমি টেবিলের কোণটায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মিনিট দুই কাটিল।

মিস্ বোস বলিলেন—তখন পাগলের মত কি বলেছি কিছু মনে ক'রো না।

—কই কিছুইত বলেন নি আপনি !

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, স্বস্তির কিম্বা দুঃখের নিশ্বাস ঠিক বুঝা গেল না। মিস্ বোস আবার নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। আরও মিনিট দুই পরে টেবিলের পাশে আসিয়া তিনি একখানি চেয়ারে বসিলেন। আজ আমার মাথায় অন্তহীন কত রকম ভাবনাই উঠিতে-

ছিল, বসিয়া বসিয়া কত সম্ভব অসম্ভব কথা ভাবিতেছিলাম। মিস্ বোস তখন এমনই কি কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে আমার মনে কিছু হইতে পারে? কেনই বা এখন তিনি সে জন্য সঙ্কুচিত হইতেছেন? মনে করিতে চেষ্টা করিলাম তখন তিনি কি কথা বলিতে গিয়া কত খানি বলিয়া কি করিয়া থামিয়া গিয়াছিলেন, আর তাহাতে আমার মনেইবা কি ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে বুঝিলাম না, তবুও অনুভব করিতেছিলাম—মিস্ বোসের কথায় নয়, আজ নয়, কবে মনে নাই, কি করিয়া জানি না আমার প্রাণের মধ্যে যেন একটা বিপুল পরিবর্ত্তনের আরম্ভ হইয়াছিল।

চিন্তা স্রোতে বাধা দিয়া মিস্ বোস্ বলিলেন—বাবা তোমাকে বড় দিনের ছুটীতে যাবার জন্যে বল্‌ছিলেন, কিন্তু তা'তে তোমার ক্ষতি হতে পারে। আমি বলি তোমার না যাওয়াই ভাল। দরকার হ'লে আমিই তোমাকে যেতে লিখ্‌ব'।

আবার যেন মনে আমার একটা ধাক্কা লাগিল, অনিচ্ছাতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—দরকারও হবে না, হেমরায় ত কাছেই থাকবে। আমি গেলে—

মিস্ বোসের মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতে আমার মুখ আপনিই বন্ধ হইয়া গেল, একবার ঢোক গিলিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলাম—এই বুঝি আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন?

—কেন নরেন, মনের মধ্যে একটা ভুল গড়ে তুলে তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ? তোমার এ ভুল ভাঙবার শক্তি এখন আমার নেই। বিশ্বাস কর, আমি তোমার ওপর এতটুকুও রাগ করিনি, বা রাগ করেই

তোমাকে হাজারিবাগ যেতে বারণ কর্চ্ছি না। জান ত, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়, আর সেই অনুপাতে বুঝ্‌বার শক্তিও বোধ হয় ভগবান একটু বেশীই দিয়েছেন আমাকে—তোমার মঙ্গলামঙ্গল দেখা আমার স্বভাবতই উচিত। সেটাত তুমি এখন বুঝবে না? অন্য রকম ভেবে, মিছে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাকে নিজের কাছেই অপদস্থ কর্চ্ছ। আমিও ভুল করেছি—কিন্তু নিজের ভুল আমি গোড়াতেই বুঝ্‌তে পেরেছি, প্রাণপণে সে ভুল শুধ্‌রাবার চেষ্টাও কচ্ছি। এখন এর বেশী আর কোন কথাই তোমাকে আমি বল্‌তে পারব' না, জান্‌তেও চেয়ো না তুমি। যদি একদিন সময় আসে—আমার নিজের ভুল আমি ভুল্‌তে পারি, তখন আমি তোমাকে তোমার ভুলও বুঝিয়ে দেব'। হেম রায়ের সঙ্গে আমার এই বন্ধুত্ব, যেটা আজ তোমার কাছে বড় অসহ্য বোধ হচ্ছে, এর উদ্দেশ্যও সেদিন তোমাকে স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে পারব'—তখন পার যদি তুমিই আমাকে ক্ষমা করো।

একটু থামিয়া একটা নিশ্বাস লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—আজ তুমি জোর ক'রেই আমাকে অনেক কথা বলালে, কি বল্‌ছি, না বল্‌ছি তার দায়ী তুমি। এসব কথা আর কখনও আমার কাছে বল' না, তাতে তোমার অনিষ্ট বই কোন ইষ্টই হবে না।

—এ ক'দিন আমার ব্যবহারে যদি তুমি মনে কষ্ট পেয়ে থাক', আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

—সত্যই যদি তুমি আমাকে বড় ব'নের মতই মনে কর', চিরদিন সে'টা আমাকে স্পষ্ট বুঝ্‌তে দিও, তোমার সুখ দুঃখের ভাগ আমাকে দিতে ভুল' না।

বলিতে বলিতে মিস্ বোস উঠিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে ঘুরিয়া গিয়া বলিলাম—যাবেন না মিস্ বোস, আমারও একটা কথা—

—গাড়ী আ-গিয়া মিসিবাবা।—দরজার নিকট হইতে বেয়ারা বলিল।

—ঠিক্ হ্যায়। অনেক রাত হয়েছে নরেন্, যাও এখন বাড়ী ফের'। কাল ষ্টেশনেই দেখা করো, এখানে আস্বার আর দরকার নেই। Good night—.

যতক্ষণ তিনি কথা বলিতেছিলেন, তাহার মধ্যে ত আমাকে একটি কথাও বলিবার অবসর দেন নাই, যখন অবসর হইল, খান্সামা আসিয়া বাধা দিল, তিনিও সেই সুযোগে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

ইচ্ছা হইল খান্সামাটাকে বেশ করিয়া দু' ঘা কসাইয়া দিই। তাহার দিকে চাহিতে নির্লজ্জ বলিল—বাবুসাব্ কোন্সা কেতাব গাড়ীমে উঠানে হোগা ?

ইঙ্গিতে র‍্যাকের বইগুলি দেখাইয়া দিয়া, নিজে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

(১৬)

মিস্ বোস আমাকে বাড়ীতে না গিয়া বরাবর ষ্টেসনে যাইতে বলিয়া দিলেও পরদিন, রবিবার, সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া ইটিলী আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাঁহাদের যাইবার উদ্যোগে যদি কিছু সাহার্য্য করিতে পারি, আর—আর যেটুকু সময় তাঁহার কাছে কাছে থাকিতে পাই।

ইতিমধ্যেই নিজের সুটকেস্, হোল্ড-অল্, ট্রাঙ্ক্ প্রভৃতি লইয়া হেম রায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এখন তাহার তত্ত্বাবধানে বেয়ারা, খান্‌সামারা বিছানাপত্র বাঁধিতেছিল, জিনিসপত্র সব বাহির করিয়া আনিয়া গাড়ী-বারাণ্ডার সাম্‌নে সিঁড়ির উপর রাখিয়া দিতেছিল।

আমি হলঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইতেই হেম রায় বলিল—ওহে ছেক্‌রা কাগজ পেন্‌সিল্ এনে জিনিসগুলোর একটা ফর্দ্দ করে ফেল, আজ না হয় একটু কাজ কর্‌লেই বা।

হাড়ের ভিতরেও জ্বলিয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল তাহার উঁচু নাকটির উপর সবলে একটা ঘুঁসি বসাইয়া দিই, বেয়াদপ বর্ব্বর কোথাকার! এক পা অগ্রসরও হইলাম।

—নরেন!

চাহিয়া দেখিলাম মিস্ বোস্ পাশের দিকের একটা দরজার উপর দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে-চোখে তাঁহার একটা আতঙ্কিত ভীত ভাব। লজ্জিত ভাবে দৃষ্টি নত করিলাম, আগের পাখানি টানিয়া

লইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম, অপমানের প্রতিশোধ লওয়া হইল না।

মিস্ বোস্ বলিলেন—ফর্দ্দকরা এখন থাক্, সব লাগেজ্ এখনও বাইরে আসে নি, এলে আমিই ফর্দ্দ ক'রে নেব'খন মিষ্টার রায়। তুমি একবার ভেতরে এস ত নরেন, বাবার ওষুধের শিশি টিশিগুলো কি ক'রে নেওয়া যায় ঠিক কর্ব্বে।

মিস্ বোসের পিছু পিছু ভিতরে যাইতে যাইতে একবার পিছনে ফিরিয়া হেম রায়ের মুখের অবস্থাটা দেখিয়া লইবার প্রলোভন দমন করিতে পারিলাম না, দেখিলাম তাহার বেগুনে রঙ্গের উপর আর এক পোঁচ রং চড়িয়াছে, দাঁত দিয়া সে নীচের ঠোঁটখানি চাপিয়া আছে, চোখে তাহার একটা হিংস্রদৃষ্টি।

বোস্ সাহেব বলিলেন—এইত নরেন এসেছে, তবে যে মা বল্‌ছিলে, নরেন আস্‌বে না, তাকে সোজা ষ্টেশনেই যেতে ব'লে দিয়েছ ?

সে কথার উত্তর না দিয়া মিস বোস্ বলিলেন—তা হ'লে ছোট হ্যাণ্ড-ব্যাগ্‌টাতেই আপনার ওষুধের শিশিগুলো নেওয়া যা'ক্ কি বলেন বাবা ? পথে ত আবার ওষুধ খাবার দরকার হবে।

—হ্যাঁ তাই-ই নিও মা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন নরেন ? বস' না, এই খাটের ওপরেই আমার কাছে একটু বস' না।

—বড় বড় লগেজ্‌গুলো গরুর গাড়ী ক'রেই ষ্টেশনে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর্‌লুম বাবা। দু'খানা গাড়ী ঠিক্ কর্ত্তে রঘুসিংকে পাঠিয়েছি। যাই আমি একবার দেখি গিয়ে টিফিন্-কেরীয়ারগুলো সব ধু'য়ে মেজে ঠিক কর্লে কি কেমন।

কাছে বসাইয়া বোস সাহেব আমাকে সস্নেহে কত কথাই বলিলেন—ট্রেণের কষ্টের কথা, কাল কখন তাঁহারা হাজারিবাগ পৌঁছাইবেন, দশ বৎসর পূর্ব্বে আর একবার তিনি সেখানে গিয়াছিলেন, সে জায়গা কেমন, কবে আমার কলেজ বন্ধ হইবে, আন্দাজ কোন্ তারিখে আমি তাঁহাদের কাছে পৌঁছাইব, কয়দিন আমার কলেজ বন্ধ থাকিবে, ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করিলেন, বিএ পাশ করিয়া আমি কি করিতে ইচ্ছা করি, বি এল্ পড়িয়া কি হইবে, ওকালতিতে এখন আর সুবিধা নাই, বরং জার্‌মানী বা আমেরিকা কোথাও গিয়া বাণিজ্য-বিদ্যা (Commerce) শিখিয়া আসিয়া এখানে স্বাধীন ব্যবসা করি, এই তাঁর ইচ্ছা। তিনি ততদিন বাঁচিয়া থাকেন বা না থাকেন, খরচের জন্য আমার ভাবিবার দরকার নাই।

সাড়ে তিনটা বাজিতেই, সসৈন্যে মিসেস্ রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই হইতে বোস সাহেবের আর কথাটি বলিবারও অবসর রহিল না, রায়-গৃহিণী নিজের সংসারের কথায়, হেমের প্রশংসায়, এবং মিস্ বোসের প্রতি তাঁহার স্নেহাধিক্যের পরিচয়ে এই নিরীহ বৃদ্ধটিকে বিব্রত করিতে লাগিলেন। ছোট ছেলে দুইটি ড়ায়নাকে তাড়া করিয়া সমস্ত বাড়ীখানিতে ছুটাপুটি জুড়িয়া দিল। শ্রীমতী রুমী ও সমী সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া, মিস্ বোসের চোখে মুখে হাসি ও কথার ফোয়ারা ছুটাইয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। হেম রায়ও তখনকার খোঁচাটা হঠাৎ ভুলিয়া গিয়া, মহা ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল, যেন মা ও ব'নেদের কাছে সে দেখাইতেছিল, এ বাড়ীতে তাহার কতখানি কর্ত্তৃত্ব, ইহারই মধ্যে সে এই পরিবারের কতখানি আপনার হইয়া গিয়াছে।

সাতটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সদলবলে ষ্টেসনে পৌছাইয়া, রিসার্ভ গাড়ী খুজিবার জন্ম ছুটাছুটী, তাহার পর জিনিসপত্র উঠাইবার হিড়িক পড়িয়া গেল।

প্রথম ঘণ্টা বাজিতেই হেম রায়কে রাখিয়া রায় পরিবার গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। আমিও বোস সাহেবকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিলাম। প্লাট্‌ফর্শ্মের দিকে একটা জানালার ধারে বসিয়া মিস্ বোস মিস্ রায়ের সহিত কথা বলিতেছিলেন। ওদিকে আর একটা জানালার কাছে হেম রায় বসিয়াছিল, তাহার মা ও ভাই-ব'নেরা গিয়া সেখানে ভিঁড় করিয়া দাঁড়াইল।

আর ত সময় নাই, এখনই গাড়ী ছাড়িবে, মিস্ রায়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া মিস্ বোসের জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। মিস্ রায় একবার বিরক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। মিস্ বোস বলিলেন— আচ্ছা রুমী, পৌছিয়েই আমি তোমায় পত্র লিখ্‌ব। Good bye.

—Good bye নীলিদি।—মিস্ রায় দাদার কাছে বিদায় লইতে চলিয়া গেলেন।

জানালার কাঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলাম—নমস্কার মিস্ বোস!

—নমস্কার নরেন্।

আমার মুখের অবস্থাটা তখন কেমন দেখিতে হইয়াছিল কি জানি। মিস্ বোস দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিলেন—আমার মনেও কি—I will—I will miss you Naren! (আমারও যে বড় মন কেমন করবে নরেন)।

—সত্যই কি তবে—

শেষ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

—ছিঃ নরেন!

গাড়ী নড়িয়া উঠিল, হঠাৎ তাঁহার মুখখানি নত হইয়া আমার হাতের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল—এতটুকু উষ্ণ স্পর্শ!

গাড়ী সরিয়া গেল, হাত শূন্যেই ঝুলিয়া রহিল, হঠাৎ কিসের একটা ধাক্কা খাইয়া নিঃসাড় হইয়া হাতখানি পাশে নামিয়া আসিল। ভিড়ের মধ্যে সে করুণ কোমল দৃষ্টিটুকুও মুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলিলাম।

মিস্ বোস চলিয়া গেলেন!

---

(১৭)

দিন কাটিতেছিল। বাড়ী হইতে কলেজে যাই, কলেজ হইতে বাড়ী ফিরি। আর কোথাও যাইবার স্থান নাই, ইচ্ছাও নাই। পড়া-শুনায় মন লাগে না, বাড়ীতে শান্তি নাই—কোন দিনই ছিল না, বিবাহের ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া অশান্তি আজকাল আরও বাড়িয়াছে। দাদা বলেন—যদি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে হয়, নিজের মতলব মত চল্‌লে হবে না, আমার কথা মতই চল্‌তে হবে, না পোষায় স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেখ'। যতদিন কর্‌বার করেছি, এখন ত খুঁটে খেতে শিখেছ, লেখাপড়া শিখে মানুস্ হয়েছ এখন আর দাদার তোয়াক্কা রাখ্‌বার তোমার দরকার কি? কিন্তু আমিও তোমায় কাছে কোন প্রত্যাশাই করি না।

বৌ'দি৹ সময়ে 'অসময়ে 'খৃষ্টান্ মাগীর' কথা তুলিয়া মনের ঝাল্ ঝাড়েন। যা‌ই কোথা?

কিন্তু শুধু এই গুলিই যদি আমার সব অশান্তির কারণ হইত! তাহা ত নয়, মনের মধ্যে সদাই যেন একটা ব্যথা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, প্রাণে কি একটা আশঙ্কা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠে। বুঝি না, বুঝিতে চেষ্টা করি না, ভয় হয়। কিসের এ ব্যথা, কেন এ ভয়? তবুও ব্যথা নামে না, ভয় যায় না। কি ভাবি, কত কথা ভাবি, তবুও যেন কি কথা ঠিক ভাবা হয় না, মনের কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড রিক্ততা

হাহা করে। মিস্ বোস এখানে নাই সেই জন্য কি? কিন্তু আপন, মা'য়ের পেটের বনও কি ভাইকে ছাড়িয়া যায় না, দূরে গিয়া স্বামীর ঘর করে না? তবে কাহার বিচ্ছেদে প্রাণে আমার এত হাহাকার, কিসের জন্য এ মরুর পিপাসা? কাহার জন্য!

মিস্ বোসকে পত্র দিয়াছিলাম। বোস সাহেবের জবানীতে তিনি তাহার উত্তর দিয়াছেন—ওখানে গিয়া বোস সাহেবের শরীর একটু ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে। মিষ্টার রায় শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবেন। আমি যেন পড়াশুনায় অবহেলা না করি, শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখি। মিস্ বোস বেশ ভালই আছেন। ইত্যাদি।

এবার বোস সাহেবকেই পত্র দিলাম—আগামী সপ্তাহে কলেজ বন্ধ হইবে। ছুটী হইলে আমাকে তিনি যাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছিলেন, যাইব কি না, কবে যাইব?—

এবারেও মিস্ বোসের হাতের লেখায় বোস সাহেবের উত্তর আসিল—দিন দিন তাঁহার শরীর ভালই হইতেছে, শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবার আশা করেন। সুতরাং পড়ার ক্ষতি করিয়া, অনর্থক কষ্ট পাইবার জন্য আমার যাওয়ার এমন কি দরকার! মিষ্টার রায় গত রাত্রে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। — —

মনে করি আর অভিমান করিব না, কিন্তু মন শুনে না। ভাবিতে চাই মিস্ বোস যতই যাহা বলুন, তাঁহারা আমার কে, মিস্ বোসের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তাঁহারা খৃষ্টান, আর হিন্দুর ঘরে আমার জন্ম। হুঁ মিস্ বোস আমার কে, কি সম্বন্ধ! তাহাই বটে!

ভাবিয়াছিলাম টাকা লইতে ইটিলী যাইব না। তবুও কত দিন

গিয়াছি, দুইবার পাঁচ টাকা করিয়া দশ টাকা লইয়া আসিয়াছি, কলেজের মাহিনা দিয়াছি।

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—কবে মাইনে পাবে ?

—ইটিলীর তারা ত এখানে নেই, মাইনে কোথায় পাব ?

—ইটিলীর তারা নেই ব'লে কি কল্‌কাতা সহরে চেষ্টা কর্লে এতদিনে আর কোথাও একটা কিছু কাজ জুট্‌ত না ? তাঁরা নেই, তবে আর কি, সংসার অচল হ'য়ে থা'ক্‌ !

বৌ'দি বলিলেন—হিংসে গো হিংসে, কলেজের মাইনে ত বেশ জুটে যাচ্ছে, আর সংসারে দেবার বেলা,—কাজ নেই, কোথায় পাব !

বড়দিন আসিল, কলেজ বন্ধ হইল, ছুটিও ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। আজ পনের দিন হাজারিবাগের কোন খবরই পাই নাই। রোজ ইটিলী যাই, যদি বোস সাহেব ফিরিয়া আসিয়া থাকেন। রঘু সিংও কোন খবর জানে না, সেও আশা করিতেছিল, আজ পত্র আসিবে, কাল নিশ্চয় 'তার' আসিবে—ষ্টেশনে গাড়ী চাই।

ছুটী ফুরাইল, বোস্‌ সাহেবেরা ফিরিলেন না, কোন খবরও আসিল না।

মাঘ মাসের প্রথমে একদিন টেলিগ্রাম আসিল—Naren come at once (নরেন অবিলম্বে চলিয়া এস)।

বুক কাঁপিয়া উঠিল, মুখ শুকাইল। বৌ'দি বলিলেন—কি গো, মেমের বে'র নেমন্তন্ন নাকি ? তার আর কি ছোট' তা হ'লে এখুনি !

ইটিলী গিয়া রঘু সিংকে বলিলাম—এখনই গোটা কতক টাকা

চাই, আজই আমাকে হাজারিবাগ রওনা হ'তে হবে, 'তার' এসেছে, খবর বোধ হয় ভাল না।

রঘু সিং তাড়াতাড়ি খান কয়েক নোট আনিয়া হাতে দিল।

টাকার যোগাড় করিয়াই ট্রেণের খবর লইলাম, চারটার সময় মোগল সরাই এক্স্প্রেস্ ছাড়িবে। তখন সবে বেলা একটা।

পরদিন বেলা এগারটার সময় মোটর-ষ্টেশনে নামিয়া একটা কুলির সাহায্যে বোস সাহেবের বাসা খুঁজিয়া পাইতে দেরী হইল না।

ভিতরে ঢুকিয়াই দেখিলাম, দরজায় কে দাঁড়াইয়া—এই কি মিস্ বোস!

হাত বাড়াইয়া দিয়া তিনি বলিলেন—টেলিগ্রাম পেয়েই তুমি আস্‌বে জান্‌তুম।

মিস্ বোসের মুর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলাম।

—বাবার অবস্থা বড়ই খারাপ, ফুলে পড়েছেন। কেউ নেই, চাকর বেয়ারা আর একা আমি।

বোস্ সাহেবের শয্যাপার্শ্বে যাইতে, তিনি চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—নরেন! এসেছ বাবা? বেশ, বস। এবার আমার দিন ফুরিয়েছে। বিদেশ, নীলি একা, বড় ভাব্‌নাই হয়েছিল। বাপের জন্য ভেবে ভেবে ও'রও মাথার ঠিক নেই। হেম রাগ ক'রে চলে গেল; বল্লুম তবুও ও তোমায় আস্‌তে লিখ্‌তে চায় না। বুড়োর যাবার সময় তোরা আবার এসব কি গোল বাঁধালি? আঃ মুখ দিয়ে খালি জল উঠ্‌ছে। দেখি মা পিকদানীটা একটু—

হিক্কা উঠিল। মিস্ বোস পিক্দানী ধরিতে, কতকটা থুতু ফেলিয়া বোস সাহেব বলিলেন—ওকি নরেন, তুমিও অমন বিহ্বল হ'য়ে প'ড়ো না। যাও মুখ হাত ধোও গিয়ে, ট্রেণের কষ্ট।

দুই মাস না যাইতেই এসব কি হইয়াছে! একমাস পূর্ব্বেও ত খবর পাইয়াছি বোস সাহেব সারিয়াই উঠিতেছেন। অবে আজ তাঁহার একি অবস্থা দেখিতেছি, শেষের যে আর বেশী দেরী নাই। মিস্ বোস, তাঁহারও বা একি হাল হইয়াছে!

তাড়াতাড়ি স্নান-আহার সারিয়া আসিয়া বোস সাহেবের শয্যা-পার্শ্বে বসিলাম। তাঁহার সেবায় মিস্ বোসকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে লাগিলাম। বৈকালে আরও দুইজন ডাক্তার ডাকাইয়া আনিলাম। সেবায়, চিকিৎসায় নতূন আয়ু আসিবে না সত্য তবুও যন্ত্রণার যতটা উপশম হয়, আর যে কয়টা দিন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি।

মিস্ বোস কলের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, দিন নাই রাত্রি নাই, নিজের কষ্ট-অবসাদ বোধও নাই। প্রাণে তাঁর আশা নাই, মুখে মূর্ত্তিমতী বিষণ্ণতা। আহা! তাহা হইবে না, আজ যে তিনি তাঁহার একমাত্র আত্মীয়কে হারাইতেছেন, এক সঙ্গে মাতৃ-পিতৃহীনা হইতে বসিয়াছেন! বোস্ সাহেবের সহিত আমার কয় দিনেরই বা পরিচয়, আমার প্রাণেও যে আজ কি কষ্ট! পিতৃহারা হওয়ার কষ্ট নিজে জানিতাম না; আজ বোস সাহেবের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বুঝিতেছিলাম, সে কত বড় দুঃখ। আমিও যে আজ পিতৃহারা হইতেছি। মিস্ বোসের মুখের দিকে চাহিতেই বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

বোস্ সাহেবের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হইতেছিল। এক দিন সিভিল সার্জ্জন বলিলেন—ইচ্ছা করেন দেশে ফির্‌তে পারেন, যদিও এ অবস্থায় সেটা একেবারেই নিরাপদ নয়।

বোস্ সাহেবও নিজের অবস্থা ভালরূপই বুঝিয়াছেন—সে জন্য তাঁহার দুঃখ নাই। এখন আর দেশে ফিরিয়া গিয়া কি হইবে? সেখানেও কেহ নাই এখানেও কেহ নাই। বিষয়-আশয়ের ব্যবস্থা, সেত অনেক দিন পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা কিছু আছে, একমাত্র কন্যা নীলিমাই সমস্ত পাইবে। মৃত্যু নিকট, মরিতে হইবে, সে জন্য আর দুঃখ কি, তিনিত প্রস্তুতই আছেন। তবে কন্যাকে কোনও যোগ্য অভিভাবকের হাতে দিয়া যাইতে পারিলেন না, এই যাহা দুঃখ। কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন, নিজের ভাল মন্দ বুঝিবার তাহার বয়স হইয়াছে এই না এখন একমাত্র সান্ত্বনা।

পথ্য আনিতে মিস্ বোস অন্যত্র গিয়াছিলেন, বোস সাহেব আমাকে বলিলেন—অল্প বয়সে নীলির বিয়ে দেবার চেষ্টা করিনি—সে ছাড়া আমার যে আর কেউই ছিল না। লেখা পড়া নিয়ে, বুড় বাপের সেবায় সেও বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছিল। সমাজের কারও সঙ্গে মিশবার সুযোগও সে পায় নি, বাহিরের পীড়াপিড়িও কিছু ছিল না। এমন সময় একদিন তোমাকে পেলুম, ক'দিন যেতে না যেতেই নিজের সদ্‌গুণে তুমি আমার বুকের মধ্যে অনেকখানি চিন্তার বিষয় হ'য়ে উঠ্‌লে। দিন কতক আপনা থেকেই মনে আমার একটা অসম্ভব কল্পনা উঠ্‌তে চাইত। যাক্ সে অসম্ভব কথা। পীতাম্বর রায়কে অনেক দিন থেকেই জান্‌তুম, হেম তারই ছেলে, তা'কে

ছোট বেলা থেকেই দেখেছি। পীতাম্বর ও তার পরিবার আকার ইঙ্গিতে, শেষে একদিন স্পষ্টই প্রকাশ ক'রে বল্লে-আমার মেয়েটিকে তারা নিতে চায়। কথাটা তখন কাণেও তুলিনি, তাড়া কি, পরে দেখা যাবে। হেম বিলেত থেকে ফিরেই নবাব্ খুব আত্মীয়তা আরম্ভ কর্লে, সে ত তুমিও দেখেছ। আমি কিছু আপত্তি কর্লুম না,—নীলির বয়স হয়েছে, নিজের ভাল সে নিজে বুঝ্বে। কিসে কি হ'ল জানি না, হঠাৎ সে দিন হেম আমাকে একটা কথাও না জানিয়ে চলে গেল। নীলিকে কারণ জিজ্ঞাসা কর্লুম, সে কিছু বল্তে চায় না, শেষে অনেক পীড়াপিড়িতে বল্লে—হেম জানতে পেরেছে, তার আশা সফল হ'তে পারে না তাই আর মিছে সময় নষ্ট না ক'রে সে বাড়ী ফিরে গেছে।

—একটু স্বস্তিই বোধ কর্লুম, হেমকে যেন আমি মন থেকে স্নেহ কর্ত্তে পারছিলুম না।

—এতদিন ভাবিনি, কিন্তু এই সন্ধ্যা বেলা মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবে নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছি না। আর যাই হ'ক, মেয়ে মানুষইত সে। তুমি ও'কে দেখো; এ ক'মাসে সেও যে আমারই মত একটু একটু ক'রে তোমার ওপর কতখানি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছে, তা'ত জানি, আনন্দও হচ্ছে মনে। সম্ভব হ'লে অন্য রকম অনুরোধ কর্ত্তুম, কিন্তু এতদিন বলিনি, আজ আর এ শেষ দিনে একটা অসম্ভব অনুরোধ কর্তে বিবেক রাজি হচ্ছে না,—ছ'টিতে ভাই বোনের মত পরস্পরকে এ বন্ধুর জীবন পথে সাহায্য করো।

পথ্য লইয়া মিস্ বোস ফিরিয়া আসিলেন। দু চামচ্ জল-বালি মুখে

লইয়াই বলিলেন—আর না। তোয়ালে দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলাম। কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন—নীলি, তোর বাবার এ কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটার ভার তোর হাতেই দিয়ে গেলুম, ছোট ভাইটিকে দেখিস্ মা, তাকে আমেরিকা পাঠাব বলেছিলুম, পারিস্ যদি বাবার কথা পূর্ণ করিস্।

মিস্ বোস বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—বাবা! তাহার পর মুখ ফিরাইয়া লইয়া, বার্লির বাটী-চামচ টিপয়ের উপর রাখিতে গেলেন।

কখন দিন শেষ হইয়া গিয়া রাত্রি আসিতেছিল, রাত্রি কাটিয়া আবার দিন ফিরিতেছিল, ঘণ্টাগুলি, মিনিটগুলি কেমন করিয়া কাটিতেছিল, সে খেয়াল ছিল না। আজ সকাল হইতেই বোস সাহেব কেমন নির্জ্জীবের মত পড়িয়া ছিলেন, অন্যদিন আমাদের সহিত কত কথা বলেন, আজ এক একবার চোখ চাহিয়া মুখের দিকে চাহিতেছেন মাত্র। সমস্ত দিনের ভিতর পাঁচ সাতটি কথাও বলিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

সন্ধ্যা বেলা মিস্ বোস আর নীরবে হৃদয়ের শোক অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলেন না, পিতার মুখের কাছে নত হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—বাবা, বাবা আজ আপ্‌নি কেন অমন নির্ঝুম হ'য়ে—

অতি কষ্টে একখানি হাত তুলিয়া কন্যার নত মাথাটির উপর রাখিয়া বোস সাহেব বলিলেন—দুঃখ করিস্‌নে মা, আজ আর বেশী কথা বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। সব ত বুঝ্‌তে পার্চ্ছিস্ মা, ছেলে মানুস্ নস্। তুই মা মুখ অমন অন্ধকার ক'রে থাকিস্ নে, তা হ'লে আমার যাবার দিনটা বড় দুঃখের হবে, মনে একটা ব্যথা নি'য়ে গিয়ে ভগবানের কাছে কি ক'রে দাঁড়াব' মা? ওঠ্, দেখ্ তোদের খাওয়া দাওয়ার কি বন্দোবস্ত হচ্ছে।

বাবা কি তোর চিরদিন থাক্‌বে পাগ্‌লি, না কারও থাকে? নরেন যে ও'র বাপকে চোখেও দেখ্‌তে পায়নি, এই সেদিন যে ও'র মা চলে গেলেন।

—আমার যে বাবা আর কেউ নেই!

ঘর ছাড়িয়া আমি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এসব শোক দুঃখের কথা ত আজ নূতন নহে, মানুষের এ চিরন্তন অভিযোগে যোগ দিলে কণ্ঠই বিদীর্ণ হইবে, কাহারও কানে সে অভিযোগ পৌঁছাইবে কি? আমার মাও ত সেদিন আমার চক্ষের সম্মুখেই চলিয়া গেলেন, ধরিয়া রাখিতে পারিলাম কি? জগতে যাঁহাকে আমার একমাত্র হিতৈশী বলিয়া চিনিয়াছিলাম, তিনি ত আজ মহাযাত্রা করিতেছেন, চোখের সাম্‌নেই দেখিতেছি তাঁহার অসহায়া কন্যা কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কি করিব? কাহার কি শক্তি আছে? মানুষ ত শুধু নীরবে বুক পাতিয়া আঘাত লইতেই পারে, নিবারণ করিবার ক্ষমতা কই!

রাত্রি শেষে পাহাড়ের বুকের অন্ধকার সরিয়া যাইতেছিল, নীচে এখনও অন্ধকার। ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে বোস সাহেব সজ্ঞানে চির বিদায় লইয়াছেন। আপনার বলিতে মিস্ বোসের জগতে আর কেহ নাই। এখনই তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইয়া কি হইবে? থাক অন্ধকার আর একটু ফর্সা হউক।

---

(১৮)

আয়োজন উদ্যোগে সে দিন কাটিল।

পরদিন—আজ সকালে বোস সাহেবের পঞ্চাশ বৎসরের সুখদুঃখ মাটীর বুকে সমাহিত করিয়া, একটা শূন্য স্মৃতি লইয়া ঘরে ফিরিয়াছি। ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে, বাতাসের বুকে এখনও তাহার আধারহীন গন্ধটুকু ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কল্য সেই দীর্ঘ মূর্চ্ছার পর মিস্ বোস, আর কোনও বিহ্বলতা দেখান নাই, যন্ত্রের মত চলিয়া ফিরিয়া পিতার শেষশয্যার আয়োজনে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মাত্র কন্যার শেষ কর্ত্তব্য চুকাইয়া আসিয়াছেন,—সম্মুখে অবলম্ব-হীন, সুদীর্ঘ নারী জীবন — ছায়া নাই, অবসন্ন দেহে ধরিয়া দাঁড়াইবার অবলম্বন নাই, কেহ নাই তপ্ত বালুর বুক হইতে তুলিয়া ধরিবে!

যে কয়টি স্থানীয় খৃষ্টান খবর পাইয়া সাহায্য করিতে আসিয়া-ছিলেন কতক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহারা সমবেদনা জানাইয়া, চারিটা সান্ত্বনারকথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি, নিজের আঘাত সহিবার শক্তি নাই আমার—আমি কি সান্ত্বনা দিব? এ রোদনভরা ক্ষীণকণ্ঠ কাহার কানে পৌছাইবে? মিস্ বোস পাথরের মত নির্ব্বাক, নিঃসাড শূন্য-দৃষ্টে বসিয়া আছেন। আজ আর পীড়িত পিতার সেবায় নড়িয়া চড়িয়া বেড়ান' নাই, তাই প্রাণ বুঝি তাঁর আর কোন্ জগতের পথ-যাত্রী, অশরীরী পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাঁদিয়া ছুটিতেছিল।

বিকাশ ও ব্যথা

ঘরের ভিতরে দুই জনে মুখামুখি হইয়া নীরবে বসিয়া আছি বাহিরে চাকর বেহারারা নিঃশব্দে চলা ফেরা করিয়া বেড়াইতেছে।

বুকে অব্যক্ত ব্যথা, সম্মুখে মূর্ত্তিমতী বিষাদ, মধ্যে নিরাকার শূন্য বাতাস। জানালার বাহিরে ইউক্যালিপ্‌টস্ ঝোপের মাথায় তরুণ সূর্য্যের আলো চিক্ চিক্ করিতেছিল।

বসিয়া বসিয়া প্রাণে শব্দ উঠিল, কণ্ঠে ভাষা আসিল—মিস্ বোস, নীলিমা!

পাষাণে প্রাণ ফিরিয়া আসিল, বুক ফাটিয়া আগ্নেয়-গিরির উষ্ণ বাষ্প বাহির হইল—বাবা চলে' গেলেন নরেন্—আর তাঁকে দেখ্‌তে পাব না? উঃ!

—স্বর্গে গেছেন তিনি।

—আমার যে আর কেউ নেই—কেউ নেই নরেন।

—ভগবান ত আছেন।

—আছেন! বাবা তাহ'লে কেন চলে গেলেন—

—ছিঃ! ওকি কথা বলছ, তাঁর সময় হয়েছিল—

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। টেবিলের উপর মাথাটা রাখিয়া মিস্ বোস আবার নীরব হইলেন।

মংরু খান্‌সামা কয়বার নিঃশব্দে দ্বারের কাছে আসিয়া নীরবেই ফিরিয়া গেল। দূরে কোথায় একটা পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। নিজেরও উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, তবুও উঠিয়া মিস্ বোসকে জোর করিয়াই স্নানের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। নাম-

মাত্র একবার ভোজন-টেবিলেও বসিতে হইল। মিস্ বোসের মুখে কথাটি নাই, চোখে এক ফোঁটা জল নাই।

সমস্ত দিন মিস্ বোসের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নীরবে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম। রাত্রে পুরাতন আয়া দায়লার হাতে মিস্ বোসকে ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের একটা ঘরে একখানা ইজি-চেয়ারে অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িলাম।

পর পর কয়দিন রাত্রি-জাগরণের পর আজ চেয়ারখানিতেই সেই-ভাবে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, মিস্ বোস ইতিমধ্যেই বাহিরে আসিয়াছেন, কল্যকার সেই ঘরখানিতে একা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ঘরে ঢুকিতে একবার ক্লান্ত দৃষ্টি তুলিয়া চাহিলেন মাত্র। মুখ চোখের অবস্থা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল কালও সমস্ত রাত্রের মধ্যে তিনি একটি বারও চোখ বুঁজেন নাই।

নীরবেই কতক্ষণ কাটিল। বুকের ভিতর ভিড় করিয়া কত কথা উঠীতেছিল, বলিলাম—কল্‌কাতায় ফিরবার ব্যবস্থা করি?

মিস্ বোস শুনিতে পাইলেন কিনা বুঝিলাম না, আবার বলিলাম—আজ রাত্রে কল্‌কাতার যাওয়ার ঠিক করি?

এবার মিস্ বোস অন্যমনস্কভাবেই উত্তর করিলেন—কল্‌কাতায়! তুমি যাও, আমার কে আছে সেখানে? বাবা যে এখানেই—

—হ্যাঁ একবার কাঁদ নীলিমা, প্রাণের ব্যথা জল হ'য়ে গ'লে যাক্। আমিও যে আজ পিতৃহারা, কি ব'লে তোমায় সান্ত্বনা দেব? কিন্তু

কেউ নেই কি তোমার? আমার অস্তিত্ব আর ত তুমি অমন ক'রে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌বে না।

মিস্ বোস সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, সজল মুখখানি মুহূর্ত্তে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, শঙ্কিতস্বরে বলিলেন—ও কি বল্‌ছ, নরেন?

—বল্‌ছি আমি কি তোমার কেউ নই মিস্ বোস? যদি জান্‌তে তোমার বাবার মনে একদিন কি ইচ্ছা জেগে ছিল, তোমার আমার জীবন এক ক'রে বাঁধবার—

বাধা দিয়া মিস্ বোস আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—চুপ, চুপ কর নরেন। তোমার পায় পড়ি আজ আমায় ওসব কথা বলো না। আজ আমার এ দুর্দ্দিনে সান্ত্বনার ছলে কেন মিছে আমার দুর্ব্বলতাকে উপহাস ক'র্চ্ছ? চুপ কর, অমন প্রলোভন আজ আমায় দেখিয়ো না।

—ছল কি? কোন্‌টা মিছে প্রলোভন বল্‌ছ' তুমি? ছল ত এতদিন নিজেদের মনের সঙ্গেই ক'রে এসেছি। আজ দু' জনের মাথায় একই শোকের চাপে সে সব ছল যে ফেঁসে গেছে—আজ তোমার কেউ নেই, দেখ্‌ছি আমারও কেউ নেই, আর কা'কে চাইব আমি? প্রলোভন কি বলছ' নীলিমা? আমার ক' ফোঁটা শক্তি, কতটুকু যোগ্যতা যে আমি তোমার ছায়া স্পর্শ কর্‌বারও স্পর্দ্ধা কর্‌তে পারি? সত্যই আমি এতদিন অন্ধ ছিলুম—নিজের মনকেও দেখ্‌তে পাই নি, তোমাকেও ঠিক চিনি নি। তোমার সেদিনকার কথা, খুঁটিনাটী ব্যবহার একটু একটু ক'রে, আজ যে একেবারে স্পষ্ট হ'য়েই আমার অন্তরে গিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে। তোমার হৃদয় আজ আমি স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

বল নীলিমা, তোমার এ বন্ধনহীন জীবনটাকে আমার এ ক্ষীণ বাঁধনে ধরা দেবে ?

বলিতে বলিতে কখন সরিয়া আসিয়াছিলাম, সজোরে আকর্ষণ করিয়াই বুঝি এবার তাঁহার বেপথুমান দেহখানিকে দুই বাহু দিয়া বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। জলভরা দুইখানি তুষার খণ্ড হঠাৎ পরস্পরের চাপে গলিয়া গিয়া জল হইয়া ঝরিয়া পড়িল—নীলিমার শুষ্ক নয়নে বান ডাকিল, আমার অশ্রুও সে বাণের জলে মিশিতে লাগিল। চির অজানা, অচেনা দুইটি তৃষ্ণার্ত্ত চুম্বন মিলিয়া এক হইয়া গেল।—ভাষা ফুরাইল।

কত যুগ, কত অনন্ত মুহূর্ত্ত যেন কাটিয়া গেল, মনে নাই। মিস্ বোস ধীরে ধীরে আপনাকে বন্দনমুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন—নরেন, নরেন, এ কি কর্লে আজ ? শোকে আত্মহারা আমি, আজ যে এতটুকু শক্তি ছিল না, কেন তুমি আমার এতদিনের এত আত্মসংযম, এত চেষ্টা এক মুহূর্ত্তেই এমন ক'রে ভাসিয়ে দিলে ? তবুও তিরস্কার কর্ত্তে পাচ্ছি না আমি। কেন এমন কর্লে নরেন ? এর পরিণাম কি জান ?

—পরিণাম তুমি আর আমি, মাঝে কেউ নেই, আর কিছু নেই।

আবার তাঁহাকে বাহুপাশে ধরিতে গেলাম, কিন্তু ধরিয়াও ধরিতে পারিলাম না, সহসা তিনি চেয়ারখানির আড়ালে সরিয়া গেলেন।

---

(১৯)

—আমি এখন দিন কতক কল্‌কাতায় ফির্‌তে পার্ব্ব না, আজই তুমি বাড়ী ফিরে যাও, কত ক্ষতি হচ্ছে তোমার বুঝছ না নরেন্। আমার ত এখন নিজের দুঃখ একা সহিবার অনেকটা শক্তি হয়েছে। কাছে থেকে আর তুমি পলে পলে আমার দুঃখ বাড়িয়ো না, এ দুঃখ ত চিরকাল আছেই, তবে আর মিছে কেন আমার কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেবে—আবার কখন কোন্ মুহূর্ত্তে দুর্ব্বলতা এসে আমার অনেক চেষ্টার ফল এ বলটুকুও ভাসিয়ে দেবে,—আমি তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না, সে যে আমার বড় দুর্দ্দিন হবে নরেন! না, এখন অন্ততঃ দিন কতকের জন্যও তুমি আমার কাছ থেকে স'রে যাও, নিজে বুঝে দেখ, আমায় ভাব্‌বার সময় দাও।

—কি ভাব্‌ব? এই পাঁচদিন ধ'রে অনেক ভেবে দেখেছি। কেন নীলিমা, আর এ আত্মপ্রবঞ্চনা কেন? কোন্‌টা তোমার দুর্ব্বলতা? যা'কে তুমি ভালবাস, যার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল হয় বল,—তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অসীম ভালবাসা, আমরণ আত্মনিবেদন নির্ব্বিচারে গ্রহণ করায় দুর্ব্বলতা, না জোর ক'রে তাকে বুক থেকে ছিঁড়ে পাথরের ওপর আছড়িয়ে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়া, কোন্‌টা দুর্ব্বলতা নীলিমা? এখন ওসব কথা তুলে লাভ কি? যে কারণেই হ'ক্ একদিন যখন তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছিলে, তখনি নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে ভুল ভাঙ্গ্‌তে চেষ্টা

করেছিলে, অন্তরের ওপর পীড়ন কর্ত্তে গিয়ে নিজের হৃদয়টাকেই শুধু অসাড় করে তুল্‌তে পেরেছিলে—ভুল্‌তে পার নি, এখনও মন থেকে আমায় তুমি একেবারে নির্ব্বাসিত কর্ত্তে পার নি, তারপর সে দিন যখন হঠাৎ আমার এ স্নেহ-ভিখারী প্রাণের চির-পিপাসী কামনা, সব বাধা ব্যবধান ভুলে গিয়ে, দ্বিধা-সঙ্কোচের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে তোমার দোরে আছড়িয়ে পড়েছিল সে দিনও ত তুমি অমন ক'রে সাড়া দিয়েছিলে, দোর খুলে তাকে ভেতরে ডেকে নিয়েছিলে, আজ কেন আবার ক'টা তুচ্ছ ব্যবধানের কথা মনে ক'রে আমাকে দূর করে দিতে চাও? সত্যই কি তুমি অনিচ্ছায় আমাকে ভালবেসে ফেলে ভুল করেছ মনে কর, এখন প্রাণে তোমার অনুতাপ হচ্ছে? তাই যদি হয় স্পষ্ট ক'রে আমায় ব'লে দাও, আমি এখনই সরে যাব—আমার এ অসম্ভব দূরাকাঙ্খা, ক্ষুদ্রের এ আকাশ-প্রমাণ স্পর্দ্ধা আমারই জীবনব্যাপি একটা লজ্জার, অনুতাপের বিষয় হ'য়ে থাকবে। সে জন্য এখন মিছে দুঃখ ক'রে কি কর্ব্বো! অভাগা আমি—আমার ভাগ্য সাথে নিয়েই আমি ঘুরে বেড়াই।

—এখনও আমায় ভুল বুঝছ নরেন? মিছে অভিমান ছাড়। সব দিক ভাল ক'রে বুঝে দেখতে চেষ্টা কর। আজ না বোঝ—দু'দিন পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে, কেন তোমাকে আমি এমন ক'রে দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্ছি।

—আবার সেই কথা! পাঁচ দিন ধ'রে বল্‌ছি ত আমি, তোমার ওসব বাজে ওজোর। ব্যবধানের কথা তুমি বার বার কি বল্‌ছ? আমার ধর্ম্ম, সমাজের দোহাই দি'য়ে আমাকে দূর কর্ত্তে চাও তুমি; কিন্তু

এ'টাও কি তুমি ভেবে দেখছ না নীলিমা, আজ যদি মানুষের গড়া এ সব কৃত্রিম পাঁচীলে ঠেকে আমার প্রাণের এ প্রবল বন্যা-স্রোত রুদ্ধ, প্রত্যাহত হ'য়ে যায়, তা'হলে কি এখানেই এ'র শেষ হ'য়ে যাবে? বরং অন্তস্থল থেকে একটা মর্ম্মভেদী অভিযোগ ঠেলে উঠে পলে পলে এই পাঁচীলের গায় আছড়িয়ে পড়ে, তার গোড়াটা শুদ্ধ কি শিথিল করে নাড়িয়ে দেবে না? আর বন্যা যদি একদিন শুকিয়েই যায়, তা'হলেও কি পাঁচীলের গায় তার একটা ফেণময় বীভৎস অট্টহাসির চিহ্ন রেখে যাবে না? তুমিই ভুল বুঝছ নীলিমা, আমার পিছনে যদি কতকগুলো শক্ত বাঁধন থাকৃত তা'হলেও না হয় স্বভাবের এ আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যেতে পা'র্ত্ত না। কিন্তু তা যখন নেই—কর্ত্তব্যের শাসন নেই, স্নেহের স্পর্শে ব্যথা ভুলিয়ে ধরে রাখবার যখন আমার আর কেউ নেই, কিছুই নেই, আমার সারাটা অন্তর যখন এক তোমাকেই চাইছে, তোমার প্রাণেও যখন তার একটা প্রতিধ্বনি কেঁদে গুম্‌রিয়ে মর্‌ছে, তখন মিছে কেন দু'টো জীবনের সুখের স্বপ্ন চিরতরে নিজের হাতে ভেঙ্গে দেবে নীলিমা?

—এই কি তোমার মনের বিশ্বাস নরেন? তা হ'ক, তবুও বল্‌ছি, এখন কিছুদিন অন্ততঃ তুমি আমার কাছে এস না, তার পরেও যদি তোমার এই বিশ্বাসই থাকে, তখন আর তোমাকে বাধা দেব না।

—হাঁ এই-ই আমার মনের বিশ্বাস, আজও এই বিশ্বাস দুদিন পরে কেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও এই বিশ্বাস থাকৃবে। তুমি আমায় অবিশ্বাস করো না নীলিমা। তোমার কাছ থেকে স'রে যাব, আর কাছে আস্‌ব না, কেন? যতদিন আমার প্রাণের এ মত্ত আকাঙ্ক্ষা

নিরাকার, অজ্ঞাত ছিল—যতদিন তুমি নিজের সঙ্গে বঞ্চনা ক'রে তোমার অন্তরের কথা আমায় জান্‌তে দাও নি, আমার প্রাণের ব্যথাটাকে আমায় চিন্‌তে দাওনি, তখন না হয় সভয়ে দূরে দূরে ঘুরে বেড়িয়েছি, তোমাকে আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে দেখে, শুধু ভক্তি আর কৃতজ্ঞতা দেখিয়েই আমার অতৃপ্ত প্রাণকে তৃপ্ত রাখ্‌তে চেষ্টা করেছি। এখন ত আর তা' হয় না। একবার যখন প্রাণ আমার নিজের পিপাসা বুঝেছে—একবার যখন তুমি ধরা দিয়েছ, তখন আর ত আমি তোমাকে এত সহজে ছেড়ে যেতে পার্ব্ব না নীলিমা। না, আমি যাব না, কোথা যাব? কোথায় আমার কি আছে? এখানেই আমার সব—তুমিই আমার ধর্ম্ম, সমাজ, স্বজন, তোমার ভালবাসাই আমার স্বর্গ, তোমার সঙ্গই আমার মুক্তি!

—চুপ চুপ কর নরেন, এত কথা কোনদিনই ত তোমাকে এক সঙ্গে বল্‌তে শুনি নি। পাগলের মত এসব কি বল্‌ছ তুমি? ওসব কথা নাটকের নায়কের মুখেই শোভা পায়। রক্ত মাংসে গড়া মানুষ তুমি, তোমার দেহের প্রতি অনুপরমানুতে আজন্মের সংস্কার, সমাজের শাসন-ভয় তোমার মজ্জাগত, হিন্দুর ঘরে হিন্দু হ'য়ে জন্ম তোমার; আজ প্রথম যৌবনের একটা মত্ত নেশায় অন্ধ হ'য়ে তুমি সে সবই ভুল্‌তে চাচ্ছ? আমিও ভিন্ন সমাজে স্বতন্ত্র সংস্কার নিয়ে খৃষ্টান মা বাপের কোলে জন্মেছি—মানুষ হয়েছি, এ কথাটাও তুমি কি একবার ভাব্‌ছ না? এ'টা একটা তুচ্ছ ব্যবধান নয় নরেন। আজ না হয় আকাঙ্ক্ষার ঘোরে এ'কে উড়িয়ে দিচ্ছ, কিন্তু দু'দিন পরে কি নিয়ে তোমার নির্ব্বাসিত সংস্কার, পরিত্যক্ত ধর্ম্ম, দূরগত আত্মীয়স্বজন ভুলে থাকবে? আজ

বিকাশ ও ব্যথা

তোমার বয়স অল্প, প্রাণের উৎকট কামনাবশে আমাকে তোমার জীবনের আশীর্ব্বাদ ব'লে মাথায় নিতে চাচ্ছ, কিন্তু দুদিন পরে যখন পূর্ণ যৌবনের শত আকাঙ্ক্ষা, চির পিপাসী প্রেম-বাসনা তোমার অন্তর-রাজ্য তোলপাড় ক'রে তুল্‌বে, তখন তুমি দেখ্‌বে পাশে তোমার বিগত-যৌবন ক্ষীণ-চেতন, বড় ভগিনীর মতই এক নীরস নারী। তখন তোমার মনে কি হবে, ভাব্‌তে পার? আজ যা'কে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ব'লে মাথায় নিতে চাচ্ছ, তখন এই আশীর্ব্বাদই যে মহা অভিশাপ হ'য়ে পাথরের মত তোমার মাথায় চেপে থাক্‌বে। আমার মনেও তখন কত বড় ব্যথা, কতখানি ধিক্কার উঠ্‌বে একবার ভেবে দেখছ কি?

আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, আমাকেই যে সব দিক দেখে বুঝেই চল্‌তে হবে। তুমিও ভেবে দেখ, বুঝ্‌তে চেষ্টা কর—যার জন্য আজ তুমি এতখানি ত্যাগ কর্ত্তে উদ্যত হচ্ছ, সে কি তোমার এ ত্যাগের যোগ্য? না, তোমার মনের ভাব চিরদিন এমনই থাক্‌বে?

ভুল বুঝ না নরেন, আমার প্রাণেও কি আকাঙ্খা নেই; আমিও মানুষ, নারী আমি, তোমার চেয়ে যে আমার কামনা দশগুণ—সহস্র গুণ বেশী। তবে সহ্য কর্‌বার শক্তিও আমার সেই পরিমাণে বেশী, নইলে প্রাণে এ মরুর পিপাসা, আকাঙ্ক্ষিত স্বচ্ছ বারিধারা আপনা থেকেই আমার পায়ের কাছে উছ্‌লে পড়ছে, আমার কি ইচ্ছা নয়—

—না নরেন, তুমি অমন ক'রে আমায় লোভ দেখিয়ো না, আর কতক্ষণ আমি, নিজের অন্তরের সঙ্গে—তোমার এ প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুঝ্‌তে পারি! সরে যাও, সরে যাও, অমন করে হাত বাড়িয়ে

কাছে এস না, এস না বল্‌ছি। ওকি! তোমার চোখে ওকি ব্যাকুল ভাব না আর যে পারি না, ভগবান! আমায় পাথর—

ব্যাকুল চুম্বনে স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, বাহু-বন্ধনে সকল বাধা-ব্যবধান শিথিল হইয়া খাসিয়া পড়িল।

—"বাঃ চমৎকার!" সহসা বাজ পড়িল, দরজার পর্দ্দাটি সরাইয়া হেম রায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। Bravo my amorous page (সাবাস আমার প্রেমিক ভৃত্য)।

Good day Miss Bose I beg your pardon, I mean, Ghosh, Mistsss Ghosh, (নমস্কার মিস্ বোস—না না এই-যে এই-যে ঘোষ, মিস্‌ট্রেস্‌ ঘোষ)।

অতর্কিত অপমানে, অসহ্য লজ্জায় মিস্ বোস মাথা হেঁট্ করিলেন।

উন্মত্ত ক্রোধে দুই পদ অগ্রসর হইতেই পশ্চাৎ হইতে মিস্ বোস্ উন্নত হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—ছিঃ তুমিও ভদ্রতা ভুলে যেও না নরেন। মিষ্টার রায়, উপস্থিত এটা আমারই বাড়ী, ভদ্র অতিথিকে সাদরে জায়গা দিতে পারি, কিন্তু—চোরের মত এসে আমার কার্য্য-করণের ওপর মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বার আপনার কোন অধিকারই নেই জান্‌বেন।

—বাশ্‌রে ওদিকে ক্রুদ্ধ সিংহের গর্জ্জন, এদিকে দলিতা ফণিনীর ফোঁস্ ফোঁসানি!

আমি এসেছিলুম সদ্য পিতৃহারা, অসহায়া প্রবাসিনীকে সান্ত্বনা দিতে, যদি কিছু সাহায্য কর্ত্তে পারি—তোমাদের সলিসিটরের কাছে কালই দুঃসংবাদটা শুনেছিলুম, ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলুম, কিন্তু এসে দেখ্‌লুম একটা সজীব কমিডি (মিলনান্ত অভিনয়)—

So I am an intruder here! Alright. I am off for the present, but I will see the interpolator by and by.

বাহিরে গিয়াও রাস্‌কেল স্থর করিয়া বলিতে বলিতে গেল—Mistress and Servant, a servant's mistreess—ta ta ta—

আকাশের বজ্র আকাশে ফিরিয়া গেল, পড়িয়া রহিল দীর্ণ, দগ্ধ দুই খণ্ড অচলশাখা।

পাঁচ দিন পরের কথা।

বেয়ারা টেবিলের উপর খান কয়েক চিঠি রাখিয়া গেল। উঠাইয়া লইয়া মিস্ বোস্ একে একে দুইখানি পত্র পড়িলেন, তাহার পর সে দুখানি এবং অপঠিত আর তিনখানি পত্রও একত্রে ছিঁড়িয়া টুক্‌রাগুলি জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

—ওকি, কতকগুলো যে না পড়েই ছিঁড়ে ফেল্‌লে?

অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—হুঁ।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—ও'তে কি কোনও অপ্রীতিকর কথা—

—আঃ বল্লুম ত, কিছু না।

অস্থির ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কি হইল? হঠাৎ কিসে এত বিরক্ত হইলেন বুঝিলাম না। এইত একটু পূর্ব্বে তিনি বেশ সহজ ভাবেই বিষয়-আশয়ের কথা আলোচনা করিতেছিলেন, ইহার মধ্যেই আবার কি হইল? তবে কি চিঠিগুলিতে সত্যই কোন বিরক্তিকর কথার উল্লেখ ছিল? কিন্তু আমার দোষ কি, আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন কেন?

সেই সেদিন হঠাৎ একটা ধূমকেতুর মত দেখা দিয়া হেমরায় কি যে একটা অশান্তি ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছিল, সেই হইতে মিস্ বোস কেমন খামখেয়ালী ভাবেই চলিতেছেন। কখনও দেখি কেমন প্রেমপূর্ণ, প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, আবার পর মুহূর্ত্তেই হয়ত মুখে অন্ধকার, বিরক্ত ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যান। এক একবার মনে হয় তাঁহার পিপাসিত কাতর দৃষ্টি যেন কি ভিক্ষা চাহিতেছে, কাছে যাই, অমনি অপ্রসন্ন ভাবে তিনি মুখ ফিরাইয়া লয়েন, সরিয়া যান্। আর একদিনও তিনি আমাকে কলিকাতায় যাইবার কথা বলেন নাই। আজও আমি এখানে আছি বলিয়া, তিনি তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট কোন ভাবই কথায় বা আচরণে আমাকে ঠিক বুঝিতে দেন না। সতত কাছে কাছে থাকিলেও মিস্ বোস নিজের চারিদিকে যেন একটা গণ্ডি রাখিয়া চলিতেছেন। দেখিতে পাই সতত তিনি সতর্ক যত্নে আমার স্পর্শমাত্রটিও এড়াইয়া যাইতেছেন। এ গণ্ডির বেড়া ভাঙ্গিতে কতবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, উন্মত্ত প্রাণে ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছি, শেষ মুহূর্ত্তেও কিন্তু গণ্ডি লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় নাই, ব্যথিত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। ক্ষুব্ধ অভিমানে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, কখনও বা শঙ্কায় হৃদয় কাঁপিতে থাকে—বার বার আমার এ উৎপীড়নে তবে কি তাঁহার মন আমার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছে!

রৌদ্র পড়িয়া গেলে মিস্ বোসের সহিত পাহাড়ের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ঢালু রাস্তা দিয়া নামিয়া আসিতেছি, তখনও সূর্য্যের শেষ রশ্মিগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অভ্র-খণ্ডের উপরে ছিনিমিনি খেলিতেছিল, কতগুলি নগ্নকায় পাহাড়ী শিশু দৃষ্টি আকর্ষণ

করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেছিল—এঁ বাবুজি, এ মায়ি এক আধেলা—

পশ্চাতে হঠাৎ একটা উচ্চ হাসির রোল উঠিল, ফিরিয়া দেখিলাম দুইটি বাঙ্গালী যুবক দ্রুত গতিতে আমাদের দিকে আসিতেছে। একজন পরিচিত বলিয়াই বোধ হইল—হাঁ সেদিন শবাধারের সহিত ইহাকে সমাধিক্ষেত্রে যাইতে দেখিয়াছিলাম বটে। যুবকদ্বয় নিকটে আসিতে আমরা পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া না গিয়া তাহারা আমাদের সঙ্গী শিশুদের সকৌতুক অঙ্গভঙ্গি দেখিবার জন্যই যেন রাস্তার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পড়িল। রাস্তাটি অপ্রশস্ত, কাজেই আমাদিগকেও দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। যুবকদুটি এক একবার বক্রদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। মিস্ বোসও পাছে ইহাদের এই অভদ্রতাটুকু দেখিয়া ফেলেন সেই ভয়ে, শিশুগুলিকে এক পাশে সরাইয়া দিয়া মিস্ বোসকে বলিলাম—চলুন সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

কয়েক পা আসিয়াই ফিরিয়া দেখিলাম যুবকদুটি আবার আমাদের পাছু লইয়াছে ; শিশুগুলি পাহাড়ের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে।

কাণে গেল পিছনে একজন আর একজনকে বলিতেছে—ছোঃ ও তোমার বাজে কথা, কেন সেক্স্‌পীয়র কি করেছিল ? আঠারো বছর বয়েসে তার মায়ের বয়সী, তিন ছেলের মা মাগীকেই ত বিয়ে করেছিল। বিলেতে ত অমন আকৃছারই হচ্ছে, তাতে আর দোষটা কি ?

—আরে, তুমি যে গোড়াতেই গলদ কর্চ্ছ, বিয়ে ক'রে ভদ্রভাবে থাক্‌লে ত আর কারও চোখে ফোঁটে না।

—হ্যাঁ, তা সে কথা বল্‌তে পার। এতে আমাদের সম্প্রদায়টারই ওপরে একটা কলঙ্ক পড়্‌ছে। ভাই, বল্‌তে পার, কি দেখে অমন একটা পিলে-রোগা মিন্‌মিনে ছোক্‌রাকে—

—আরে তা বুঝি জান না, শোননি কি বাংলায় একটা কথা আছে যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম্। ওহে these are the freaks of the blind diety (এ সব সেই অন্ধ দেব্‌তাটির লীলা)।

—যাই হোক্ ছোক্‌রার কিন্তু খুব বরাত জোর বল্‌তে হবে,—তোমার আমার দিকে ত কোন বিড়ালাক্ষী ফিরেও চায় না? অদৃষ্ট ভাই অদৃষ্ট—

উভয়েই বুঝিতেছিলাম কাহাদের উপর কটাক্ষ করিয়া এ সব বিষাক্ত বাণগুলি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। অপমানিত রোষে মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতে লাগিল। মিস্ বোস বলিলেন—চল আমরা ঐ পাথরখানায় ব'সে একটু অপেক্ষা করি।

এবার আর আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইবার কেনও উপলক্ষ্য না পাইয়া যুবক দুইটি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

আমার ক্রোধ-বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া মিস্ বোস নীরবে একটু হাসিলেন। কিন্তু সেই একটু হাসিতে যে কতখানি জ্বালা, অপমানিত আত্ম-সম্মানের কতখানি আর্ত্তনাদ লুকাইয়াছিল, বুঝিতে আমার বাকী রহিল না।

কতকটা পথ নীরবে আসিয়া মিস্ বোস বলিলেন—ওদের ওপর রাগ করা মিছে, ওদের দোষ কি?

বিকাশ ও ব্যথা

—নাঃ ওদের কিছু দোষ না বৈকি, বেয়াদপ বর্ব্বরগুলো! ওদের দোষ না ত কি দোষ আমার?

মিস্ বোস উত্তরে আবার একটু হাসিলেন।

(২৩)

একেই ত বিফল ক্রোধে শরীর জ্বলিতেছিল, তাহার উপর মিস্ বোসের তখনকার শ্লেষপূর্ণ হাসিতে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। বাকী পথটুকু নীরবে আসিলাম। আহারের সময়েও কোন কথা তুলিলাম না। মিস্ বোসেরও কথা বলিবার কোনই আগ্রহ দেখা গেল না। আহারান্তে তিনি অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া যাইতেছিলেন। এতখানি নীরব উপেক্ষা এবার আর সহ্য হইল না, পশ্চাৎ হইতে ডাকিলাম—মিস্ বোস!

মিস্ বোস ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে আসিয়া পরিত্যক্ত চেয়ার খানিতে আবার বসিয়া পড়িলেন, এখনও মুখে কথাটী নাই। ডাকিলাম ত, কিন্তু কথাটা কি বলিয়া আরম্ভ করিব খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। মিস্ বোস বলিলেন—কি? বল।

—বল্‌ব বৈকি। তোমার মনের কথাটা আমায় খুলে বল দেখি; কেন তোমার এরকম আচরণের মানে কি? তোমাকে এখানে একা রেখে আমি চলে যাইনি, তোমার কথা রাখতে পারিনি ব'লে কি তুমি আমার ওপর রাগ ক'রে রয়েছ? না তোমার মনে এরই মধ্যে অনুতাপ এসেছে, তাই এ নির্লিপ্ত উদাসীনভাব? মনের ভাবটা স্পষ্টই বলে ফেল না।

—কি হবে?

—কি হবে! বেশ, প্রতিকারের উপায় থাক্‌লে আমি প্রতিকারই কর্ব্ব—তা'তে আমার যা হয় হবে।

—এখন আর কি প্রতিকার কর্ব্বে? সে দিনও ত বলেছিলুম, কথা শুনেছিলে কি? এখনও যদি তুমি আমার কাছ থেকে সরে যেতে নরেন্!

—বেশ, তা'তে যদি তুমি সুখী হও তাই যাব। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি, কেন?

—কি কেন?

—কেন আমি তোমায় ছেড়ে যাব? আমি কি তোমায় ভালবাসি না? না তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ—তুমি আমায় ভালবাস না, কোনও দিন বাসনি? কি কারণে তুমি আমায় তাড়াতে চাচ্ছ?

—এখনও কি তোমার ভুল ভাঙ্‌বে না নরেন? Sentimentalismএ (ভাব প্রবণতায়) অন্ধ হ'য়ে তুমি যদি তোমার ভাল-মন্দ না দেখ, তাহ'লে কি আমার কর্ত্তব্য না সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া? কারণ, আমিই যখন এসব অনর্থের হেতু। আমি তোমায় ভালবাসি না, কোনও দিন বাসিনি, এই যদি তোমার এতদিন পরে সন্দেহ হ'য়ে থাকে, সে ত ভল কথাই, আমায় ছেড়ে যাওয়াটা ত তাহ'লে তোমার পক্ষে সহজই হবে।

—হ্যাঁ খুবই সহজ হবে! সত্যই কি নীলিমা তোমার ভেতরে এতটুকুও প্রাণ নেই? আমার ভালমন্দ দেখ্‌ছ তুমি! গোড়াতেই সে দিন বলেছি—তুমি ছাড়া জগতে আমার আর কোন প্রার্থিত মঙ্গলই নেই। তোমায় ছেড়ে যাওয়া, আর জগত ছেড়ে যাওয়া

ছুই-ই আমার কাছে সমান, তাই আমি তোমাকেই চাই নীলিমা, আর কিছু চাই না।

—তুমি আমাকে চাও মানে, আমার এই দেহটাকেই চাও, এই ত তোমার মনের কথা? তা' না হ'লে আমারও যে একটা স্বতন্ত্র মঙ্গলামঙ্গল থাক্‌তে পারে, আমারও যে একটা আত্মা ও ধর্ম্ম আছে, সমাজের ভয় আছে সেটা কি এমন ক'রে ভুল্‌তে পার্ত্তে? স্বকর্ণেই ত আজ শুনে এলে—এরই মধ্যে এই বিদেশেও আমার নামে কতবড় একটা কুৎসার সৃষ্টি হয়েছে। দেশে ফির্‌বার পথও বুঝি বন্ধ হয়েছে—সে দিনকার সে চিঠিগুলো দেখেছিলে, সে গুলো আর কিছুই না, কলকাতার পরিচিত মহলের একটা দারুণ অভিযোগ,—প্রকাণ্ড ধিক্কার!

—এ সবের গোড়ায় সেই রাস্কেল্ হেম রায়ের ঈর্ষ্যার ঝাল!

—সে কথা ব'লে ত আর এখন ব্যাপারটাকে একেবারেই উড়িয়ে দিতে পার্‌ছ না। আর তারই বা দোষ কি? তুমি কি মনে কর আমাদের সমাজটা এতই উচ্ছৃঙ্খল যে এই রকম অভিভাবকহীন—একটা আত্মীয়ও কাছে নেই—এ অবস্থায় একটা নিসম্পর্ক বাহিরের পুরুষের সঙ্গে আমার এই এক বাড়ীতে একত্রে বাস সমাজ চুপ ক'রে সহ্য কর্‌বে? একটা প্রতিবাদও কর্ব্বে না?

তাইত, এদিকটা ত আমি একেবারেই ভাবিয়া দেখি নাই। মনে করিয়াছিলাম—আমার কি, আমি আমার সমাজ, ধর্ম্মের ধার ধারি না, আমি নীলিমাকে চাই, তাহাকে পাইবার জন্ম আমি সবই করিতে পারি। এখন মিস্ বোসের এ কথায় কি উত্তর করিব?

মিস্ বোস বলিতে লাগিলেন—তুমি আমায় ভালবাস, আমিও তোমায় ভালবাসি, বাশ তবে আর মিলনে বাধা কি? নিজের নিজের সমাজ ধর্ম্ম নিজের নিজের পথ দেখুক্ গিয়ে! কিন্তু দু'দিন পরে যখন দেখ্‌বে, জগতে কেউ তোমায় আমায় স্থান দেয় না, এই জনাকীর্ণ জগতে তুমি একা—একেবারে নিঃসঙ্গ, সমাজে স্থান নেই, আত্মীয়, বন্ধু কেউ কোথাও নেই, ভগবানকে যে ডাকবে তা'ও একটা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম নেই, তখন তোমার মনে কি হবে, আমারই বা মনে কি হ'তে পারে, তা' কি একবার তুমি ভেবে দেখেছ?

আমাকে পে'তে চাও তুমি, কিন্তু আজই তুমি তোমার বাপ-পিতা-মহের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, আত্মীয় স্বজন যেখানে যে আছে তা'দের সঙ্গে চিরকালের মত সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে, আজই এই দণ্ডে তুমি খৃষ্টান্ হ'তে পার কি? মেনে নিলুম এখন না হয় প্রথম নেশায় মত্ত হ'য়ে তা'ও হ'লে তুমি। কিন্তু দু'দিন পরে যখন তোমার নেশার ঘোর কাট্‌বে তখন যে তোমার মনে অনুতাপ হবে না, এই আমারই ওপর ঘৃণা হ'বে না, তার নিশ্চয়তা কি? ভবিষ্যতের কথা না হয় ছেড়ে দিলুম, স্বীকার ক'রে নিলুম তুমি আমার জন্য সবই কর্ত্তে পার, সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তে পার, এই মুহূর্ত্তে খৃষ্টান হ'তে পার, কিন্তু খৃষ্টানেরও যে একটা সুরুচি কুরুচি, একটা সমাজ-নীতি আছে সেটাকেও ত ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পার না, তাই না আজ আমাকে পথের মাঝে অমন ক'রে অপমানিত হ'তে হ'ল, কল্‌কাতায় মুখ দেখান'র উপায়ও রইল না।

—সত্যই কি তুমি আমাকে ভালবাস না নীলিমা?

—ভুল নরেন' ভুল্! তাই যদি হ'ত, তা হ'লে তুমি কি মনে

কর নীলিমা এতখানি সহায়হীন হ'য়েছে যে তুমি জোর ক'রেই তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপাতে পার্ত্তে, না, তোমার কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আজ তা'কে এত ব্যাকুল হ'য়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হ'ত? ভুল, ভুল সন্দেহ তোমার।

মনে করনা আমি তোমার ভালবাসি না, হয়ত তোমায় চেয়েও শতগুণ ভাল বাসি। কিন্তু ভাল বাস্‌লেই যে একেবারে অন্ধ হ'তে হবে এ কথা আমি মান্‌তে পারি না। যত বড়—Psychologist (মনস্তত্ত্ববিদ্) যাই বলুন, আমি কিন্তু বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না, প্রকৃত ভালবাসা মানুষকে অন্ধ করে, নিজের ও প্রণয়পাত্রের মঙ্গলামঙ্গল, আত্মার কল্যাণ, ভবিষ্যতের শান্তি সবই ভুলিয়ে দেয়। যে ভালবাসা তা' করে, সেটাকে আমি ভালবাসা বল্‌তেই রাজী নই, সেটা একটা ইতর লালসা, সৃষ্টির স্পৃহা, দুদিনে তার তৃপ্তি দু'দিনেই সমাপ্তি। প্রকৃত ভালবাসা অন্তরের জিনিস, দেহের সঙ্গে তা'র এতটুকু সম্বন্ধ নেই। রাগ করো না নরেন, এইখানেই তোমার ভালবাসা আর আমার ভালবাসার প্রভেদ। অবশ্য আমি বল্‌ছি না, আমার দেহেরও একটা ক্ষুধা নেই, প্রাণে কোনও উৎকট কামনা নেই, মানুষ আমি, দেবতা নই। তবে যতদূর সম্ভব সেটাকে আমি দমনে রাখ্‌তে চাই। তুমি যদি বার বার তা'তে বাধা দাও, আমার কতটুকু শক্তি বার বার প্রত্যাখ্যান করি? এই-ই না তোমায় স'রে যেতে বলার আমার উদ্দেশ্য।

—এত বিচার, এত যুক্তি তর্ক, তার পর তোমায় ভালবাস্‌ব, তোমার ভালবাসা পাবার জন্য ব্যাকুল হব! তা' হলে Love at first

sight (প্রথম দর্শনেই প্রণয়) ব'লে একটা কথাও থাক্‌ত না, বা তুমি এত বুঝে স্থঝেও ভুল ক'রে আমাকে ভালবাস্‌তে না, কি আমিও তোমাকে একভাবে ভালবাস্‌তে গিয়ে শেষ্‌টা আর একভাবে প'ড়ে এমন ক'রে জ্বলে পুড়ে মরতুম না, না হ'ত তোমাকে সকাল সন্ধ্যা এত Ethics (নীতিতত্ত্ব) আবৃত্তি কর্ত্তে। ওসব আমি বুঝি না, প্রাণ তোমাকে চায়, তুমিও আমার ওপর বিরূপ নও, আমি তোমাকেই চাই, তা'তে আমার সব ত্যাগ কর্ত্তে হয়, ত্যাগ কর্ব্ব, খৃষ্টান হ'তে হয় এই দণ্ডে হব,—না পারি, তুমি ধরা না দাও, মর্‌লেই সব জ্বালা নিভে যাবে।

—ছিঃ নরেন্‌! পাগ্‌লামী করো না। ভাল ক'রে বুঝে দেখ দেখি—ভালবাসা আর লালসার পরিতৃপ্তি দু'টো কি এক? ভালবাসার প্রথম অবস্থাটাতে বিচার বিবেক কিছু নেই সত্য। Love at first sight (প্রথম দর্শনে প্রণয়) হবে না কেন? আর সত্যই ত প্রথমেই অত বিচার তর্ক থাক্‌লে তোমাকে কি আমি ভালবাস্‌তুম, না তুমি আমাকে ভালবেসে এত অশান্তি ভোগ কর্ত্তে? ভালবাস্‌লুম, ভাল মন্দ কিছু দেখ্‌লুম না, দুদিন হা-হুতাশ কর্‌লুম, বাস্‌ তার পরেই অম্‌নি মিলন হ'য়ে গেল—এটা শুধু কল্পনার জিনিস, নাটক নভেলেই সম্ভব, বাস্তব জীবনে এমনটি হয় না। যদি কোনও কবি বা লেখক ধৈর্য্য রেখে মিলনের পরেও আর দু'চার পাতা লিখ্‌তে পার্ত্তেন্‌, তা হ'লে দেখ্‌তে তারপর কি, এ মিলনের পরিণামটা কেমন! বাস্তব জীবনে যখনই এ রকম একটা মিলন সম্ভব হয়েছে, দুদিন পরেই দেখা গেছে পরিণামটা তার বর্ত্তমান স্থখের অনুপাতে কত অশান্তির!

—বেশ বার বার আর সে কথার দরকার কি? ভবিষ্যতের ভয়টাই

যদি তুমি এত বড় ক'রে দেখ, আমার ভালবাসার স্থায়িত্বে যদি তোমার এত সন্দেহই হয়, তবে আর তোমায় আমি বিরক্ত কর্ব্ব না, ভবিষ্যতেও যাতে আর কখনও বিরক্ত কর্ত্তে না পারি সে উপায়ও কর্ব্ব, বেশ আমি সরেই যাব। তোমার ধর্ম্ম, তোমার আত্মার কল্যাণ অক্ষয় হ'ক্, ভবিষ্যৎ তোমার নিষ্কণ্টক, সুখময় হ'ক্।

—এতদিনে এই বুঝ্‌লে নরেন্? যাক্ আর অভিমানে কাজ নেই, আর আমি বাধা দেব না, নারীত্বটুকুই যদি আমার ভালবাসার একমাত্র পরীক্ষা হয়, তাই নাও তুমি। দু'দিনের লালসা-তৃপ্তির জন্য যদি তুমি তোমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট কর্ত্তে চাও, জগত-জোড়া ধিক্কার আর বুক-পোরা অনুতাপই যদি আমার সম্বল রাখ্‌তে চাও, তবে তাই কর, আর আমি বারণ কর্ব্ব না। ভাই ব'নের পবিত্র স্নেহে যে ভালবাসার আরম্ভ, উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় তার সমাপ্তি হ'ক।

—মিছে কথা, অকারণ অভিযোগ! আমি কি তাই চেয়েছি?

—তবে কি চেয়েছ, কি চাও তুমি?

—আমি তোমাকে পেতে চাই, তোমার সমাজ, তোমার ধর্ম্মের ভিতর দিয়েই আমি তোমাকে পেতে চাই। ত্যাগ যা কিছু কর্‌বার আমিই কর্ত্তুম, তুমি শুধু আমাকে তোমার আপনার ক'রে নিয়ে—আমার এই তীব্র ভালবাসা-পিপাসাটা মিটিয়ে দেবে এই আমি চেয়েছিলুম, কিন্তু তা যখন হবার নয়, তখন আর কথা কি? এবার আমার নিজের পথ দেখে নিতে হবে—জ্বালা ত নিভাতে হবে—সুধার অভাবে বিষই বা মন্দ কি? ভালই হ'ল, আজই একটা বোঝা-পড়া হ'য়ে গেল।

—না, বোঝাপড়ার ত এখনও শেষ হয়নি। কি বুঝ্‌লে তুমি? তুমি তোমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে আমার হও, আমি অক্ষুণ্ন থাকি, আমার সব বজায় থাক্‌, এই-ই আমার এত কথার উদ্দেশ্য, মনের ইচ্ছা, তাই বুঝ্‌লে কি? এখনও আমি বাধা দিয়ে আমার ওপর তোমার আসক্তি বাড়াবার চেষ্টা কচ্ছি, তাই ভাব তুমি? তাই কি তুমি তোমার নিজের ওপর অত্যাচার কর্‌বার ভয় দেখাচ্ছ আমাকে?

কি ক'রে তোমাকে বোঝাব নরেন,—আমার জন্য তোমার এই সর্ব্বস্ব ত্যাগটাকেই যে আমি মন থেকে মেনে নিতে পাচ্ছি না? আজ তুমি প্রথম কামনায় অন্ধ হ'য়ে একটা নারীর বিনিময়ে—তোমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ব্বে, তারপর জীবনব্যাপি একটা অনুতাপ, ব্যর্থ জীবনের বিরাট হতাশা সম্বল কর্ব্বে, এ যে আমি চোখে দেখ্‌তে পার্ব্ব না! তাই না তোমায় আমি বার বার এত ক'রে বল্‌ছি—কাছ থেকে, স'রে গিয়ে দুদিন ভাল ক'রে ভেবে দেখ—তখনও যদি তোমার মনে এই বিশ্বাস দেখ্‌তে পাও যে, আমাকে না পেলে তোমার জীবন সত্যই দুর্ব্বহ হবে, আমার জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌বে, তখন আর আমি তোমায় বাধা দেব না। নইলে, আমিও মানুষ—নারী, আমার কি প্রাণে কামনা নেই, আমার কি ইচ্ছা নয় আমার প্রাণের একমাত্র কাম্যকে পেয়ে সফল হওয়া?

—ওসব মুখের কথা, কথার হেঁয়ালীর আর দরকার নেই। এখন স্পষ্ট কথায় আমায় ব'লে দাও, তোমার এত বিচার, বিবেচনায়

আমার ওপর কি আদেশ কর্ত্তে চাও। বুঝ্‌ছিই ত তবুও একবার তোমার মুখেই শুনে রাখি।

কাছে আসিয়া নত হইয়া আমার তিক্ত ওষ্ঠদ্বয় চুম্বনে সরস করিয়া দিয়া বলিলেন—অভিমান ত্যাগ কর, দুঃখ করো না নরেন, তোমার জীবনের সুখ-শান্তি, তোমার মঙ্গলই আমার জীবনের এক মাত্র কাম্য ; আমায় তুমি অবিচার করো না নরেন। এখন দিন কতকের জন্য তোমাকে আমি দূরে যেতে বল্‌ছি ব'লে আমাকে নিষ্ঠুর মনে করো না, মনে করো না আমি তোমায় কম ভালবাসি। তোমাকে ছেড়ে দিতে, তোমাকে দূরে রাখ্‌তে আমার কি কষ্ট হবে না, না প্রাণ কাঁদবে না? তুমি হয়ত তোমার পড়াশুনো নিয়ে আর পাঁচটা কর্ত্তব্যের মধ্যে প'ড়ে অনেকটা ভুলে থাকতে পার্ব্বে, কিন্তু আমি কি নিয়ে ভুলে থাকব? বাবা চ'লে গেছেন, আমার যে এখন আর কেউ নেই, কিছু নেই। তবুও আমি জোর ক'রে তোমাকে দূরে যেতে বল্‌ছি, কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমরণ তোমার ভালবাসা পেতে চাই, আজ তুমি পরিণাম না বুঝে, আমাকে কাছে টেনে নেবে, তারপর দু'দিন না যেতে ঘৃণা ক'রে দূরে ফেলে দেবে সে যে আমার সহ্য হবে না, দু দিনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির বিনিময়ে তুমি আজীবন অশান্তি, অনুতাপ ভোগ কর্ব্বে এ আমি কোন দিনই চোখে দেখ্‌তে পার্ব্ব না।

—তবে, তবে কি তুমি কোন দিনই আমার হবে না? আমাকে চির বিদায় দিতে চাও নীলিমা?

—তোমাকে চির বিদায়! না, নরেন। একদিন তোমায় না দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণে কি হবে অন্তর্যামীই জানেন!

বাবা নেই, আমার আর যে কেউ অভিভাবক নেই, জানত আমাদের একটা Mourning Period (অশৌচ কাল) আছে, যার ভেতর কোন শুভ কাজ হতে পারে না। তুমিও ততদিন একটু ধীরে সুস্থে বুঝে দেখ, তারপর যদি তোমার এই ইচ্ছাই থাকে, তখন আর তোমায় বাধা দেব না। আর তোমার মনের যদি এরই মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তা হ'লে—তা হ'লে—। তোমায় এক মিনিটের জন্যও কাছ ছাড়া কর্ত্তে আমার যে কী কষ্ট! না নরেন—

হঠাৎ থামিয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বলিলেন—রাত হয়েছে নরেন, শোও গিয়ে, শরীর খারাপ হবে।

নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; আর কি বলিব? যাহা বলিবার ছিল, নীলিমা আজ যে সবই শেষ করিয়া দিয়াছে!

একবার আমার দিকে চাহিয়া, একবার নিঃশেষপ্রায় বাতিটার দিকে চাহিয়া, একটু চেষ্টা করিয়া মিস্ বোস্ বলিলেন—কালই, তা হ'লে তুমি কল্‌কাতায় যাও। আমিও দিনকতকের জন্য কোথাও যাই, এখানে আর আমি একদিনও থাক্‌তে পার্ব্ব না।

'আচ্ছা' বলিয়াই বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, দ্বারের কাছে আসিতেই পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ হাত খানি ধরিয়া ফেলিয়া ব্যথিত স্বরে বলিলেন—এখনই তুমি অমন মুখ অন্ধকার ক'রে যেয়ো না নরেন, তা হ'লে আমি যে—

সকাতর, ভিখারী দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—নরেন—নরেন, নিজে এতক্ষণ এত উপদেশ দিয়েছি, এখন আমার একটা দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর্ব্বে? আজ একবার—একটি বার—আদর ক'রে—একটি—

দু' হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া, নিজেই নিজের তৃষ্ণা মিটাইয়া লইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র, তাহার পর ত্বরিতে চঞ্চল পদে পলাইয়া গিয়া নিজের ঘরে আশ্রয় লইলেন। সশব্দে দ্বার রুদ্ধ হইল।

পিপাসিত, ও বুভুক্ষু আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াই রহিলাম। বাতিটি একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া পরক্ষণে নিভিয়া গেল।

নিদ্রা-হীন শয্যার সন্ধানে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

---

(২৯)

তেইশ দিন পরে বাড়ী ঢুকিতেই বৌ'দি বলিলেন—খুব্ যা' হ'ক! কি গো বাবু, বে' দেখা হ'ল, না, নিজেই বে' ক'রে এলে? ছিঃ ঘেন্না; ঘেন্না আর কি! তবুও রক্ষে বিদেশ বেভুঁয়ে, নইলে এদ্দিন কি আর মুখ দেখাতে পার্ত্তুম! তা' এখন দয়া করে মনের কথাটা আমাদের খুলে বল্লেই হয়, আমাদের আর সঙ্গে সঙ্গে এমন ক'রে ঝুলিয়ে রাখা কেন? ভেঙ্গেই বলে ফেল না—খৃষ্টান হবে, মেম্ বে' কর্ব্বে, তার আর বাকিই বা কি ভগবান জানেন! তা আমরা তোমার পায় কি অপরাধ করেছি, না জেনে যদি করেই থাকি, ঘাট হয়েছে আমাদের, এমন ক'রে কাচ্চা বাচ্ছা শুদ্ধু আমাদের দয়্ মজিয়ো না, দোহাই তোমার!

নিরুত্তর থাকিয়া আমি জামা-জুতা খুলিতেছি দেখিয়া বৌ'দি আরও আগুন হইয়া উঠিলেন—তোমার দাদা আসুন—আমিও পষ্টই ব'লে দিচ্ছি, গরিব লোক আমরা, কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই, ওসব ধাষ্ট্যমি এখানে থেকে চল্‌বে না, কেউ ত আর ছাতা দিয়ে আমাদের মাথা রাখে নি।

—বৌ'দি মিছে রাগ কচ্ছে কেন? বোস্ সাহেব—

—হ্যাঁ হ্যাঁ মিছে রাগ করাই ত বৌ'দির স্বভাব। বোস্ সায়েব—বোস্ সায়েব্ কি কর্ব্বে আমার, শুনি? ও আমার ইষ্টি গুরুরে! তা যাও না তোমার সে সায়েব শ্বশুরের কাছে, কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে আস্‌তে ব'লেছিল।

গজর গজর করিতে করিতে এবার তিনি সশব্দে উপরে চলিয়া গেলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে অন্য কেহই খবর লইল না—সেদিন আমার আহারের আবশ্যক ছিল কিনা।

দাদা বাড়ী আসিয়াই বাহিরের ঘরে আমাকে দেখিয়া বলিলেন—এখানে কেন? ছেলে মানুষ হ'লে জুতিয়ে বাড়ী থেকে বা'র করে দিতুম, ভাল মুখেই বলছি, এখনই ভালয় ভালয় সরে পড়—আমার বাড়ীতে আর তোমার জায়গা হবে না।

মনের অবস্থা একেই ত ভাল ছিল না, সমস্ত দিন অনাহারে শরীরও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, তাহার উপর অকারণেই এতখানি বাড়াবাড়ি সহ্য হইল না, মাথার ভিতর আগুন হইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—আচ্ছা।

সেই রাত্রেই গৃহ ত্যাগ করিয়া একটা মেসে আসিয়া উঠিলাম। স্নেহশূন্য গৃহের সহিত সকল সম্বন্ধ জন্মের মতই শেষ হইয়া গেল।

*   *   *   *   *

সেই হইতে আমি একেবারেই একা, আমি কাহারও নই, জগতে কেহ আমার নয়। যাহারা এতদিন আপনার হইয়াও পরের মতই ছিল, এখন তাহারা পর হইতেও পর। যে পরকে আপনার করিতে এই বিভ্রাট সে ত পরই রহিয়া গিয়াছে, তাহাকে আজও আপনার করিতে পারিলাম না—কোনও দিন পারিব কি?

মিস্ বোসের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার এখন আমারই উপর,

তাঁহার সলিসিটররা আমার পরামর্শ ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে মিস্ বোস বলিয়াছিলেন—আমাকে যখন তুমি ভালবাস, আপনার মনে কর, তখন আমার যা কিছু আছে সেটাও তোমার নিজের মনে করে ইচ্ছামত ব্যবহার করো, নইলে মনে আমি বিশেষ ব্যথা পাব। আমার যখন যা' দরকার তুমিই পাঠিয়ে দিও।

সুতরাং আজ বিপুল সম্পদ আমার অধীনে, ইচ্ছা করিলে, অর্থে যত-দূর সম্ভব সমস্ত সুখই আমি ভোগ করিতে পারি। কিন্তু কাহাকে লইয়া, কাহার ঐশ্বর্য্য আমি ভোগ করিব? নীলিমা যে আমারই জন্য সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর মত দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য-সুখ! আমি যে নীলিমাকেই চাহি!

মনে হয়, কেন তখন অত সহজেই তাহাকে ছাড়িয়া শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম? পরিচিত স্থানে অবস্থান অসম্ভব হইয়াছিল, দূর দেশে অপরিচিতের মাঝে চলিয়া গেলাম না কেন? তাহার পর সময় হইলে সমাজ দেখান একটা বাহিরের বাঁধনে তাহাকে বাঁধিয়া লইয় আবার পরিচিতের মাঝে ফিরিয়া আসিতাম।

প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা, শূন্য হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে, মনে হয় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠি, ছুটিয়া গিয়া নীলিমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি, বলি—এ'র চেয়ে তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও নীলিমা, সেও আমি হাসিমুখে মাথা পেতে নেব, কিন্তু এ যন্ত্রণা আর না।

মধ্যে মধ্যে মিস্ বোসের পত্র আসে, সেই একই কথা—নিজের কর্ত্তব্য, পড়া শুনা—

ছাই কর্ত্তব্য, পড়াশুনা জাহান্নামে যা'ক্।

মন আর কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। নবোদ্গত যৌবনের প্রথম স্বপ্ন, প্রেম-পিপাসা, দিশেহারা বাসনার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যাকুল আসঙ্গ-লিপ্সা—সে কি অরুন্তুদ নিপীড়ন!

---

(২২)

তবুও দিন যাইতেছিল। দুর্ব্বহ জীবন, প্রাণে এই জ্বালা, কর্ত্তব্যে অবহেলা,—তবুও আমার দিন যাইতেছে। নীলিমা যে দূরে সেই দূরে। সত্যই কি সে আমাকে ভালবাসে?

নীলিমা প্রথমে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা তাহার পর লাহোরে বেড়াইল। এখন একজন আয়া ও একটি খান্‌সামা মাত্র সঙ্গে লইয়া সে অমৃতসরে বাস করিতেছে।

সে যদি আমায় ভালবাসে তাহা হইলে আজও এমন করিয়া দূরে দূরে পলাইয়া বেড়াইবার তাহার দরকার কি? কাহাকে সে এড়াইয়া চলিতেছে, আমাকে, না তাহার নিজের অন্তরকে? নীলিমা যদি আমাকে ভুলিয়া যায়! তাহাই কি তাহার এই অস্থির পর্য্যটনের উদ্দেশ্য?

আবার দীর্ঘ পত্র লিখিলাম। উত্তরে মিস্ বোস্ লিখিল—

নরেন,

এখনও অবিশ্বাস? তোমাকেই বা বলি কি, আমারও কি ভয় হয় না, যদি তুমি রাগ কর, আমার এ স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-বঞ্চনায় ভুল বোঝ—যদি তুমি আমায় আর না ভালবাস! প্রেমের বুঝি এই-ই রীতি, তোমার কি দোষ! তোমার জীবন দুর্ব্বহ হয়েছে, কিন্তু আমিই বা কতসুখে আছি নরেন,—অন্তর্যামীই জানেন।

তোমাকে কাছে পাবার, দেখ্‌বার ছোঁবার জন্য আমারও প্রাণ কি ব্যাকুল হয় না? আজ ক'মাস যে তোমায় দেখিনি নরেন, মনে হয় কত যুগ যুগান্ত কেটে গেছে, তোমায় আমায় দেখা নেই। সেই হাজারি-বাগে দুজনের বিদায়, সে কি আজকার কথা! কিন্তু—কিন্তু নরেন, কি কর্ব্বো আমি? হৃদয় পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, তবুও সে ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে বিবেক আমার হাত পা অবশ ক'রে রেখেছে।

কবে আমি কল্‌কাতায় ফিরব, কবে আবার দেখা হবে, জান্‌তে চেয়েছ? আমারও ত এক একবার ইচ্ছা হয়, ছুটে যাই; প্রাণ তোমার জন্য কেঁদে ওঠে, মন আর বিবেকের মানা মান্‌তে চায় না। উঃ সে সময়টা কি যন্ত্রণা!

কি সুন্দর দেশ এটা! যে দিকে যখন চাই, সবই সুন্দর! কিন্তু প্রাণে আমার তৃপ্তি নেই, অমনি মনে হয় তুমি যদি কাছে থাকৃতে, দুজনে পাশাপাশি ব'সে যদি এ অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্ত্তে পেতুম!

হাঁ, আমি ফিরেই যাব এবার।

কিন্তু তার আগে তুমি যদি কথা দাও নরেন, জোর ক'রে তুমি আমার কাছ থেকে বন্ধুর প্রাপ্য, ভায়ের প্রাপ্যের বেশী অধিকার চাইবে না, আমি যতদিন স্বইচ্ছায় তোমাকে সে অধিকার দিতে না পার্ব্ব, ততদিন তুমি অনুরোধ কর্ব্বে না, পীড়ন কর্ব্বে না, তবেই আমি দেশে ফিরব। আমায় বিশ্বাস কর নরেন, আমি তোমায় ভালবাসি—খুবই ভালবাসি, শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত আমি তোমায় কাছে পেতে চাই, তোমার জীবন-সঙ্গিনী হ'য়ে তোমার সুখ-শান্তি বিধান করা, এই আমার জীবনের এখন একমাত্র কামনা। আমার ভাল-

বাসায় তুমি কোনও দিন সন্দেহ করো না নরেন। কিন্তু তুমি আমায় যে ভাবে চাও, আমি ঠিক সেই ভাবেই কি তোমায় ভালবাসি? আজও যে আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না, তোমার প্রতি আমার এই দুর্নিবার আকর্ষণ কি আকারে কোন্ ভাবে আকৃষ্ট কর্চ্ছে? একদিন এক রকম ভেবেছিলুম, তারপর আর এক রকম মনে হয়েছিল, আজও কিন্তু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না, এ আকর্ষণের ঠিক স্বরূপ কি, কি ভাবে এ ব্যক্ত হ্তে চায়! নারী আর পুরুষের ভালবাসা, কিসে তা'র সফলতা?—হৃদয় বলে, পরস্পরের সুখ-শান্তি বিধানে, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধনেই নারী পুরুষের ভালবাসার সার্থকতা, সৃষ্টিই নারী পুরুষের ভালবাসার উদ্দেশ্য, সৃষ্টিতেই তা'র সফলতা। ইচ্ছা হয় ছুটে যাই, তোমার আমার অস্তিত্ব এক ক'রে দিই, কামনার তৃপ্তি হ'ক!

কিন্তু মনের কোন্ কোণ থেকে আবার কে যেন আমায় বোঝাতে চায়—না, তা ত নয়, হ'তে পারে সৃষ্টি নারী-পুরুষের ভালবাসার একটা উদ্দেশ্য, সৃষ্টিতে তার কতকটা সফলতা, কিন্তু প্রেমের মূল উদ্দেশ্য ত তা নয়। ভালবাসার উদ্দেশ্য ভালবাসাই, ভালবাসাতেই তার সার্থকতা।

তোমায় আমি ভালবাসি, কেন এত ভালবাসি? তোমায় আমি পেতে চাই, কেন পেতে চাই? আকাঙ্ক্ষা ত দুদিনেই মিটে যাবে, সঙ্গে সঙ্গেই কি এ ভালবাসারও শেষ হ'য়ে যাবে?

না, নরেন, এখনও আমি ঠিক কর্ত্তে পার্লুম না তোমার আমার এ ভালবাসার পরিণতি কিসে, কি ভাবে এ'র অভিব্যক্তি হ'তে চায়!

তবুও আমি ফিরে যাব।

আবার আমার জন্মতিথি আস্‌ছে। এবার তুমিই যে নরেন আমার একমাত্র অতিথি, আর কেউ আস্‌বে না, বাবাও নেই। এবার আর তোমায় অভিমান ভরে ফিরে যেতে হবে না। শীঘ্রই আমি কল্‌কাতায় ফির্‌তে চাই, শীঘ্র তুমি উত্তর দিও। আমায় নিরাশ করো না নরেন, কথা দিও—আরও কিছু দিন তুমি অপেক্ষা কর্ব্বে, তারপর তাই যদি ভগবানের উদ্দেশ্যই হয়, তখন আর কেউ আমাদের মিলনে বাধা দেবে না, আর আমি তোমায় বারণ কর্ব্ব না।

আজ অনেক কথাই লিখ্‌বার ছিল, তোমার অনেক কথারই উত্তর দেওয়া হ'ল না—মাপ করো নরেন, আজ আর কিছুই ভাব্‌তে পার্চ্ছি না আমি। বিদায় নরেন্

তোমার নীলিমা।

(২৩)

অপেক্ষাই করিতেছি। সকাল গিয়া দুপর আসিয়াছে, দুপরের পর সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে রাত্রি আসিতেছে, এখনও আমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। কাল নয়, আজ নয়, কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে, নীলিমার বুঝা-পড়ার আর অন্ত হয় না, আমার অপেক্ষারও আর অবসান হইল না। যৌবনের উত্তাল আকাঙ্ক্ষা শুকাইয়া গিয়াছে, বাসনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সংসার-সুখের ছবি ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে মুছিয়া শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে, তরল ভালবাসা বুকের মধ্যে জমাট বাঁধিয়া বরফ হইয়াছে, হৃদয় অসাড় হইয়া আসিল, আজও অপেক্ষার শেষ নাই।

তবে কি আমার এ অসীম ভালবাসা বিফলেই গেল! কি জানি! সামাজিক বন্ধন, কামনার পরিতৃপ্তি, সৃষ্টির বর্দ্ধনই যদি ভালবাসার চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের এই বন্ধনহীন, নিষ্ফল ভালবাসা ব্যর্থই হইয়াছে। নীলিমা ত সে ভাবে ধরা দিল না।

কিন্তু আজ এই জীবন-সায়াহ্নে কি করিয়া বলি, নীলিমার এ আজীবন আত্মত্যাগ নিরর্থক হইয়াছে? সে যে বিশ বৎসর পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল—ভালবাসার অনুশীলনই ভালবাসার উদ্দেশ্য, প্রেমময়ের প্রেমেই তাহার পরিণতি। বুঝিয়াছিল বলিয়াই ত বিশ বৎসর পূর্ব্বে, দূর দেশান্তর হইতে সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া-

ছিল—আমি ভালবাসার দোহাই দিয়া নিজের ইহকাল পরকাল বিপন্ন করিয়া, জোর করিয়াই তাহাকে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিব না, তবেই না সে তাহার স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর তাহার সমস্ত জীবন-টাইত এই নিষ্কাম ভালবাসার অভিব্যক্তি হইয়াই আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেত মনে-প্রাণেই আমায় ভালবাসিয়াছে। আমার মঙ্গলের জন্যই সে যে তাহার নারী জীবনের সকল কামনাই ব্যর্থ করিয়াছে, আমার সুখ-শান্তি বিধানে সে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটিই নিয়োগ করিয়াছে, এখনও এ প্রৌঢ়ের জন্য তাহার কতই ব্যাকুলতা! সে জগতকে ভাল বাসিয়াছে, নিজের সামর্থ্য, যথা সর্ব্বস্ব দিয়া জগতের কল্যাণ কামনা করিয়াছে, একটা সমাজ একদিন অকারণ ঘৃণায় তাহাকে দূরে ফেলিতে চাহিয়াছিল, আর আজ জগত-সমাজ সাদরে, সশ্রদ্ধায় তাহাকে বুকে লইতে চাহে। নীলিমা আত্মত্যাগে, কামজয়ী সংযমে ভগবানকে ভালবাসিয়াছে, বুঝি সে ভগবানের ভালবাসাও লাভ করিয়াছে। ঐ সৌম্যমূর্ত্তি, স্নেহময়ী প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া আজ কে বলিবে তাহার জীবন বিফল গিয়াছে, তাহার নারী-জন্ম নিরর্থক হইয়াছে?

* * * * *

খাতাখানা এতকাল কোথায় পড়িয়া ছিল, মনেই ছিল না। বিশ বৎসর পরে হঠাৎ সে দিন বিস্মৃতপ্রায়, ব্যথাময় যৌবন-স্মৃতি বুকে লইয়া এ খানি আবার আমার হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিন টেবিলের উপর জীর্ণ খাতাখানি রাখিয়া নীলিমা প্রশান্ত-মধুর হাস্যে

বলিয়াছিল—এটা আবার কবেকার কীর্ত্তি তোমার? এত কথা মনেও বা ছিল তোমার?

পাতা উল্টাইতেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল,—এ—এ'খানা কোথায় পেলে নীলিমা? হাজারিবাগ থেকে যখন তুমি আমায় বিদায় ক'রে দিয়েছিলে, কল্‌কাতায় ফিরে এসে ওসব পাগ্‌লামী চেপেছিল, ডাইরী দেখে দেখে তখন ওখানা লিখে ফেলে-ছিলুম। এতদিন কোথায় ছিল এ'খানা?

—তোমার ঘরের আল্‌মারীর নীচের থাকে কতকগুলো পুরাণো কাগজের মধ্যে। আল্‌মারীর তলাটা পোকায় কাটছে, পরিষ্কার কর্ত্তে গিয়ে রামা ওখানা পায়। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—

পাগ্‌লামীই সত্যি! এখন একবার ওখানা আগাগোড়া পড়্‌লে তোমারই হাসি পাবে।

নীলিমা বলিল বটে আমারও হাসি পাইবে, কিন্তু সে যখন নিজে খাতাখানি পড়িয়াছিল তখন কি সে শুধুই হাসিয়াছিল? তবে এখনও তাহার মুখে ও কিসের একটা ছোপ লাগিয়া রহিয়াছে, ঐ সহাস্যভাবের ভিতর দিয়া তবে কেন ঐ কি যেন কি একটা ভাব ফুটিতে চাহিতেছে?

অন্যমনস্কে পাতা উল্টাইয়াই যাইতেছিলাম। নীলিমা কাছে আসিয়া বার্দ্ধক্য-শ্লথ দুইখানি হস্তে আমার এই পক্ক-শ্মশ্রু, শুষ্ক-পলিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আদ্র স্বরে বলিয়াছিল—এক বার ভাল ক'রে আমার দিকে চাও—হাঁ, এবার মন থেকে বল—আমায় ভালবেসে সত্যই কি তোমার জীবন বিফল হয়েছে? আজও কি বল্‌বে, তুমি আমায় পাওনি, তোমার ভালবাসা ব্যর্থ গেছে?

একি! আজ নীলিমার স্বরে এ গাঢ়তা কেন! বার্দ্ধক্যের জড়তা কি? চক্ষে ও কি ব্যকুলতা দেখিতেছি, না দৃষ্টিক্ষীণতা?

কি জানি কি ভাবিয়া বলিয়াছিলাম—আর কেন নীলিমা? রাত ত হ'য়ে এসেছে, আর দেরী কিসের?

ক্লান্তভাবে আমার কাঁধের উপর মাথাটি রাখিয়া সে বলিয়াছিল—নাঃ আর দেরী কি! এবার বুড়' বুড়িতে একে একে যাত্রা করা যাবে।

—একে একে কেন? আবার কি এখনও ছাড়াছাড়ি হবে? নাঃ, বুড়'ই তা হ'লে আগে আগে যাবে, তুমি পরে এস।

—আমি যে তোমার আগে এসেছি, এখনও আগে যাবার দাবী আমারই।

ও খাতাখানা কি কর্ব্বে? আরও দু'এক পাতায় শেষটা লিখে রাখ না।

—তাই হবে। এত কাল পরে আজ এখানা নষ্ট কর্ত্তে মায়া হয়, কিন্তু কারও হাতে পড়্‌লে হয়ত লোকে ভুল বুঝ্‌বে। তোমাকে অবিচার কর্ব্বে।

—সে কথা না, আমাদের জীবনটা ত কত লোকের কত ভালমন্দ, কত আলোচনারই বিষয় হয়েছিল। শেষটাও যদি লেখা থাকে, ওখানা কোনও দিন যদি কারও হাতে পড়ে তা'হলে, হয়ত আসল কথাটা কেউ না কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে,—বুঝ্‌বে আমাদের এ দুটো জীবনে কত বড় একটা সত্য কেমন ক'রে সফল হ'য়ে উঠেছে—দেহের আকাঙ্ক্ষা পূরণই ভালবাসার সাধনা নয়।

তাই আজ বিশ বৎসর পরে আবার এই কীটদষ্ট জীবনী-খাতায় আরও দু'খানা নূতন পাতা জুড়িয়া দিলাম।

শেষও ত হইয়া আসিয়াছে, এখন যাইবার মুহূর্ত্তের অপেক্ষা।

দেখি নীলিমা উঠিয়া একা কোথায় গেল। অনেক্ষণ পূর্ব্বেই ত সে আমার পাশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, কোথায় গেল? সত্যই কি সে আমার আগেই যাইবে? সমস্ত জীবনটি ত তাহার সঙ্গে আমি চলিয়া উঠিতে পারি নাই, সমস্ত পথটাই ত সে আগে আগে, পথের কাঁটা সরাইতে সরাইতে আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছে, কতবার ধরিয়া তুলিয়া, কত যত্নে ব্যথা ভুলাইয়াছে।

আচ্ছা, নীলিমা কি মানুষ, নারী?

—নীলিমা!

সমাপ্ত

ARY PUBLIC LIBRARY
EST. 1886

আমাদের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস

ধর্ম্মপত্নী—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। যতীন্দ্রবাবুর পারিবারিক উপন্যাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যতীনবাবুর উপন্যাস বঙ্গ-গৃহলক্ষ্মীদের একমাত্র আদরের সামগ্রী সুন্দর ছাপা, বিলাতী বাঁধাই।

স্বয়ম্বরা—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত সামাজিক উপন্যাস, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানিতে সমাজের অনেক চিত্রই আছে। সকলের পাঠ করা উচিত। এ্যাণ্টিক কাগজে ছাপা রেশমী বাঁধাই।

বিয়ের কণে—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত বৈচিত্র্যময় সামাজিক উপন্যাস। ভাব, ভাষা, ঘটনা আগাগোড়া নূতন। এণ্টিক কাগজে ছাপা, রেশমী বাঁধাই, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

কমলিনী—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল, প্রণীত সুন্দর উপন্যাস মূল্য ১॥০। ছাপা বাঁধা সকলই সুন্দর।

মিলন—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সচিত্র সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস। উপহার দিবার মত এমন পুস্তক আর একখানিও নাই, নিঃসঙ্কোচে পুত্রকন্যার হস্তে প্রদান করা যায়। রঙ্গিন কালীতে ছাপা, তুলার প্যাডে রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সতীর-স্বর্গ—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসের মধ্যে 'সতীর স্বর্গ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ২য় সংস্করণ। রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১।০ মাত্র।

সতীলক্ষ্মী—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। রেশমে বাঁধা মূল্য ২৲ টাকা।

লক্ষ্মীলাভ—৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। এ এক নূতন ধরণের নূতন উপন্যাস। পল্লী-জননীর নিখুঁত চিত্র। স্বর্ণমণ্ডিত রেশমে বাঁধা, মূল্য ১।০ মাত্র।

স্বর্ণকুটির—দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত সুন্দর উপন্যাস। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুরঞ্জিত রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

হরপার্ব্বতী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, হরপার্ব্বতীর অপূর্ব্ব লীলা। উপন্যাস অপেক্ষাও মধুর। যেমন ছাপা, তেমনি বাঁধা, মূল্য ১৷০ টাকা।

স্বর্ণ-প্রতিমা—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রেশমে বাঁধা সচিত্র সুন্দর প্রকাণ্ড সামাজিক উপন্যাস। স্বর্ণ-প্রতিমা হিন্দুগৃহের উজ্জ্বল চিত্র। পুণ্য-প্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ। মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র।

বিন্দুর বিয়ে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কন্যার বিবাহে পিতার দীর্ঘশ্বাস, অভাবের দারুণ হাহাকার, বঙ্গগৃহের প্রতিদিনের ঘটনা। নয়নরঞ্জন চিত্র, রেশমে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কমলার অদৃষ্ট—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১॥০ টাকা।

সঙ্গিনী—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। সঙ্গিনী বঙ্গকুলললনা মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। বিবাহিত জীবনে যাহাতে রমণীর সমস্ত সুষমা নির্ম্মাল্য হইয়া উঠে, এই পুস্তকে অতি সরল ভাবে তাহারই পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সঙ্গিনীতে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ সঙ্গিনীগণের জীবনী প্রদান করা হইয়াছে। তুলার প্যাডে রেশমে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সুখের মিলন—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত অপূর্ব্ব সামাজিক উপন্যাস। সুন্দর বাঁধা, মূল্য ১॥০ টাকা।

পরাশ্রিতা—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস। উপন্যাসখানির আগাগোড়া নূতন। এমন ঘটনাবহুল উপন্যাস বহুকাল বাহির হয় নাই মূল্য ১॥০ টাকা।

সতীরাণী—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস বিবাহবাসরে উপহার দিবার একমাত্র পুস্তক; দ্বিতীয় সংস্করণ, তুলার প্যাডে বাঁধা মূল্য ১৲ এক টাকা।

রংবাহার—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত প্রহসন। মিনার্ভা থিয়াটারে মহা সমারোহে অভিনয় চলিতেছে। মূল্য ।৵০ আনা।

ভাগ্যবতী—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রণীত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

ভোরের আলো—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। বঙ্গকুললক্ষ্মীর একটী মর্ম্মান্তিক মনস্তাপের কথা গ্রন্থকারের

অপূর্ব্ব লিপিকৌশলে অসাড় হৃদয়েও সাড়া তুলিবে—সমাজের একটি কঠিন সমস্যার মীমাংসার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে—অদম্য আগ্রহে গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইবে। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১।৹ টাকা মাত্র।

বিসর্জ্জন—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১।৹ টাকা মাত্র।

অনাদৃতা—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১।৹ টাকা মাত্র।

মুস্কিল আসান—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১।৹ মাত্র।

স্নেহের দান—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, প্রণীত সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস। ভাবে, ভাষায়, ঘটনাবৈচিত্র্যে ও কল্পনার নূতনত্বে এই অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাসের তুলনা নাই। মূল্য ২৲ টাকা।

ভাগ্যহীনা—শ্রীমতী—দেবী প্রণীত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস। সুন্দর কাগজে সুন্দর বাঁধা, মূল্য ॥৹ আনা।

হাতের নোয়া—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। সুন্দর বাঁধা; মূল্য ২৲ টাকা।

আলোকে আঁধারে—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। সুন্দর কাগজ ও বাঁধাই। মূল্য ১।৹ টাকা।

স্বপ্ন পরিণীতা—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধান, মূল্য ১।৹ টাকা।

দিশেহারা—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত বৃহৎ গার্হস্থ্য উপন্যাস। ভাবে, ভাষায় অনুপম, চরিত্র-সৌন্দর্য্যে মনোরম। ভাল বাঁধাই। মূল্য ২৲ টাকা।

হীরার কণি—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত। হীরক-খণ্ড। মূল্য ১।৹ দেড় টাকা।

প্রীতির নিদর্শন—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত নূতন বৈচিত্র্যময় উপন্যাস। ভাবে, ভাষায় অতুলনীয়। ২৲ টাকা।

আশার আলো—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। মূল্য ১।৹ টাকা।

পশরা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। (২য় সংস্করণ) মূল্য ১।৹

জগবন্ধু—শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ প্রণীত ধর্ম্মমূলক উপন্যাস মূল্য ।৹ আনা।

সুহাস—শ্রীচরণ দাস ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১।৹ টাকা।

সোণার কমল—শ্রীচারুশীলা মিত্র প্রণীত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১।৹ টাকা।

একালের মেয়ে—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্য উপন্যাস। মূল্য ১।৹ টাকা।

কেরাণীর মাসকাবার—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১।৹ টাকা।

একটা কিছু—শ্রীকালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

কুলদেবী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

প্রীতি—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

মনের দাগ—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা।

শঙ্করাচার্য্য—শ্রীরাখাল দাস কাব্যানন্দ প্রণীত। জীবন চরিত—বৃহদাকার পুস্তক। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখকের অন্য উপন্যাস—

১। **ভাগ্য-নিরূপিতা**—(সামাজিক উপন্যাস)—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্রায় ৪০০ শত পাতা, সুন্দর কাগজ, ঝকঝকে ছাপা, মনোরম বাঁধাই। **প্রবাসী** (মাঘ ১৩২৯) বলেন—পতিতা রমণী সোনালীর চরিত্র, লেখক বড় সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন, পড়িতে পড়িতে সোনালীর দুঃখে প্রত্যেক পাঠকেরই মন ব্যথিত হইয়া উঠিবে। নারী যে নারী, সে হাজার পাপে পাপী হইলেও তাহার অন্তর দেবতা যে একেবারে মরিয়া যায় না, ভালবাসার পাত্রের জন্য যে সে তাহার ইহকালের সমস্তই ত্যাগ করিতে পারে, পতিতা নারী সোনালীর জীবনে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য চরিত্রগুলিও বেশ পরিষ্কার। কোথাও ফেনানো ভাবাধিক্য নাই বলিয়া বইখানি সুপাঠ্য হইয়াছে।"

২। **পরিণয়-পারে**—(সামাজিক উপন্যাস)—'আমি তোমায় ভালবাসি, ওগো তুমিও কি আমায় ভালবাস?' —এ ভাবের উপন্যাস নিত্যই ত কত পড়েন, বাস্তবে এমন ঘটনা কতখানি সম্ভব তা' আপনিও যেমন জানেন, উপন্যাসকারেরাও মনে মনে বেশ বোঝেন। পরিণয়ের পরে ওরকম নবীন ভাবের রঙিল নেশা ক'দিনই বা থাকে, তখন ব্যর্থ-আশা বুকের ভেতর কি ব্যথার আবির্ভাব হয়, অনুভব

করেন কি ?—পুরুষের হৃদয় নারীর কাছে কি চায় ? সহানুভূতি পিপাসী অন্তরের চিরন্তন হাহাকার—নিঃসঙ্গ প্রাণের চির অব্যক্ত ব্যথা—নারীর আত্মত্যাগী প্রেমের নিষ্ফলতা—আকাঙ্ক্ষার আকুল স্পন্দন, প্রভৃতি অনেক সত্যই এই সুদীর্ঘ পুস্তকে আত্মপ্রকাশ করেছে। নব পরিণীত, পরিণীতাগণের জান্‌বার অনেক জিনিষ এ বই খানিতে থাক্‌লেও, এর আগা গোড়াই সব অবস্থার সব নারী পুরুষের অন্তরের কথা—অব্যক্ত ব্যথার সাড়া।